যা দেখেছি যা শুনেছি

শশিশেখর বসু

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি

ভূমিকা

শশিশেখর বসুর জন্ম ১লা ভাদ্র ১২৮১, মৃত্যু ১৪ই ফাল্গুন ১৩৬১। অল্প বয়সেই তিনি পায়োনিয়ার ইংলিশম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। সরসতার জন্য তাঁর রচনা লোকে অতি আগ্রহের সহিত পড়ত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে Humorous Sketches নামে তাঁর একটি রচনাসংগ্রহ এলাহাবাদের পায়োনিয়ার প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।

আটাত্তর বৎসর বয়সে তাঁর বাংলা লেখার খেয়াল হয়। তার পূর্বে তিনি বোধ হয় নিজেও জানতেন না যে মাতৃভাষায় সরস রচনায় তাঁর সহজাত শক্তি আছে। শশিশেখরের প্রথম বাংলা রচনা আমার হাতেই আসে এবং আমি তার প্রকাশের ব্যবস্থা করি।

তাঁকে আমি উৎসাহিত করেছিলাম সে কারণে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখতে আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। শশিশেখরের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমি যে স্নেহ লাভ করেছি, তারই ঋণ এতে সামান্য শোধ করতে পারব এই আশায় সেই অনুরোধ পালন করছি।

শশিশেখরের সব চেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁর মনখোলা ব্যবহার। তাঁর লেখার সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের অদ্ভুত মিল ছিল। তাই তাঁর রচনা সম্পর্কে কিছু বলবার আগে তাঁকে চেনা দরকার।

অন্যের মনে দুঃখ দিতে পারতেন না। তিনি অসুস্থ হলেও পাছে আমি দুঃখ পাই, সেজন্য অসুখ গোপন করতেন।

১৯৫৪ সালে মে মাসের শেষের দিকে রাত্রে আমার হৃৎস্পন্দন সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে কষ্ট পেয়েছিলাম।

শশিশেখর ৬ই জুন আমাকে পোষ্টকার্ডে লিখেছেন : "বুকের স্পন্দন বন্ধ হয় বিশেষ কারণে। কবি হেমচন্দ্রের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল : "তারে যে পাবার নয় তবু কেন মনে হয়।" শ্রীকৃষ্ণ গেয়েছিলেন, "কাঁহা মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা মেরি রাই।" মহাত্মা একবার রেলে অসুস্থ হলেন : হার্ট বীট বন্ধ। গাড়িতে সুশীলা নায়ার ছিলেন, চিকিৎসা করলেন। যখন চেতনা হল জিজ্ঞাসা করলেন "সুশীলে! কেন এমন হল?" সুশীলা অবনতমুখী! বললেন, "আমাকে দেখে হয়েছিল।"

তারপর ৯ই জুন লিখেছেন—"...এর পূর্বেকার পোস্টকার্ড পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিও ভাই, কি জানি কেউ দেখলে 'ডিফেমেশন' হবে!

তিনি যেমন শিশু ছিলেন (১৯৫৪, ১৩ই আগষ্ট লিখছেন : আমি ১৬ ই আগস্ট ৮১ বছরে পা দেব। হামাগুড়ির দেরি নেই!)—তেমনি ছিলেন মনখোলা। মন কতখানি খোলা যায় তা হিসেব করতে পারতেন না। তা যে অনেক সময় 'প্রুডারি'র যুগে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাও বিশ্বাস করতে পারতেন না। সে জন্য প্রেসে দেবার আগে তাঁর লেখার উপর কড়া নজর রাখতে হত। আধুনিক কালে যে সব কথা বিশেষ ক'রে খবরের কাগজে ছাপা বিপজ্জনক তার অদলবদল ক'রে নিতে হত। এজন্য একদিন 'ভূমিকম্প' নামক প্রবন্ধটি পাঠিয়ে তার সঙ্গে লিখছেন—(১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৪) "ভূমিকম্প" পাঠালাম, একদম নিরামিষ! ভাই, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট ও বাগবাজারে যাতে আপত্তি তাতে তো বঙ্কিমের আপত্তি নেই!!

"তুর্লভ ছোটে! হায় কাছা খুলিয়া গিয়াছে।" (১ম খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ দেবী চৌধুরাণী)

"ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খুলিয়া পড়ে।" (ঐ ৩য় খণ্ড)

"কি রে মাগী!"—চন্দ্রশেখর (মাগী দেদার)

ভাই, একটু লাইসেন্স না দিলে আমার নাম ডুববে। এ প্রবন্ধে এ সব কিছু নেই। ভূঁইকম্পে যখন ছুটছিলাম তখন কাছা ঠিক ছিল।"

তাঁর রচনার বিষয়গুলো অধিকাংশ আমিই ঠিক ক'রে দিতাম, তাতে তাঁর লেখার সুবিধা হত।

আমাদের উভয়ের বাসস্থান পাঁচ ছ মিনিটের ব্যবধানে। তাই চিঠি আদান প্রদান হত খুব। তিনি চিঠির উত্তর দিতেন খুব দ্রুত, টাইপ ক'রে অথবা হাতে লিখে। ছাপার জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠাতেন তা অতি পরিচ্ছন্ন থাকত, এক পাতায় দশবারো লাইনের বেশি লিখতেন না।

লেখকের ব্যক্তিত্বই যদি তাঁর স্টাইল হয় তবে একথা শশিশেখরের লেখার সম্পর্কে বেশি সত্য। আশা করি তাঁর ব্যক্তিত্ব-পরিচয় কিছু পরিমাণ দিতে পেরেছি এই সব ছোট খাটো ঘটনার মাধ্যমে, এবং মনে হয় তাঁর আর কোনো পরিচয় অবশিষ্ট রইল না।

তাঁর এই সরল উদার সহৃদয় এবং সরস ব্যক্তিত্বকেই তিনি লেখার মধ্যে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছিলেন। সাধারণ বৈঠকী গল্প, সাধারণ দেখা ও জানা জিনিস সবই, অথচ প্রত্যেকটি বাক্য রসে যেন ফেটে পড়ছে। এ গুণ আয়ত্ত করা সাধারণ লোকের ক্ষমতার বাইরে। শশিশেখর সাধারণ ছিলেন না।

যে লেখা ভঙ্গিসর্বস্ব, তার আয়ু কম। কিন্তু যে লেখায় কৃত্রিম

অলঙ্কার নেই, যা অনাড়ম্বর, সহৃদয়তা যার প্রধান গুণ, সে লেখা চিরায়ু হতে বাধ্য।

শশিশেখরের প্রত্যেকটি রচনা তাঁর সহৃদয় ব্যক্তিত্বের সরল হাসিতে ঝলমল। তাই আমার বিশ্বাস এই রচনাগুলি কোনো যুগেই পুরনো হবে না

২৭-৮-৫৫ পরিমল গোস্বামী

সূচীপত্র

সোনপুর কাহিনী

সোনপুর পাটনার ওপারে। এই ধূলা-বালির প্রশান্ত বিস্তার নীলকুঠেল সাহেবদের বলডান্সে কলঙ্কিত। এই সীমাহীন মাঠ ও মেলার পুরাতন ইতিহাস মদ্যপান ও জুয়ার জন্য বিখ্যাত। এই কেলেঙ্কারি-কণ্টকিত মেলা নাকি পৃথিবীতে, সব চেয়ে বড় ক্যাট্‌ল্‌ফেয়ার। প্ল্যানটারদের হাতে এই সোনপুর মেলা প্রতি বৎসর নভেম্বরে কি আকার ধরত? অথচ প্ল্যানটারদের সঙ্গে মেলামেশা হলে দেখা যেত তারা লেখাপড়া জানা লোক, ভদ্র ব্যবহার করতো রে:ল জাহাজে। তারা অনেক কেতাব লিখে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ভরিয়ে চলে গেছে। একজন হংকং ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলরও হয়েছিল। 'ইনডিয়ান [illegible]স গে:জট' খুব ভাল সাপ্তাহিক ছিল। বিহারে 'নেটিভ' এস্টেটে তারা বাঙ্গালী ম্যানেজারের নীচে থাকতে কোন রকম আপত্তি জানাত না। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন মিথিলায় বড় বড় অ্যাস্ট্রনমার ইওরোপ থেকে এলেন তাঁরা এই প্ল্যানটারদের বাড়ী অতিথি হয়ে সূর্যের পূর্ণগ্রাস দেখেছিলেন।

প্ল্যানটারদিগকে ধ্বংস করলে কে? 'নীলদর্পণ' অভিনয়, সিনথেটিক নীল, গান্ধী ও সোনপুর ফেয়ার। ধিক তোরে সিনেমা! তোর দ্বারা [illegible] কার্য হতো না। আমরা সেকেলে লোক, আমাদের কাছে ঘোড়ার [illegible]য়, কর্ড মেল, থিয়েটার, রাজকেষ্ট রায়ই ভাল; আর দীনবন্ধু।

নীলদর্পণ অভিনয়ে একটা 'সাহেব' এক বাঙ্গালীকে লাথি মারল। [illegible]রা দেখে ক্ষেপে উঠলাম। স্টল, পিট, ড্রেস-সার্কল মার! মার!

কাট! কাট! করে উঠে স্টেজ ভাঙ্গে আর কি, সে 'সাহেবটা'কে মারবে বলে।

'চোপ্ চোপ্, মারবেন না, ইনি বাঙ্গালী গালে চুন মেখে সাহেব সেজেছেন'—পরিচালকরা এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে দর্শকদের রাগ দূর করলেন। একজন গ্যালারী থেকে উত্তর দিল, 'নীলকুঠেল সেজেছেন তো দুগালে চুন কেন? এক গালে কালি দাও।'

কালীঘাটে সাদা পাঁঠা বলিদান দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এক বিখ্যাত নেতা। উত্তর বিহারে এক অশ্বারোহী দুর্দান্ত প্ল্যানটার এক বৃদ্ধ আমীনকে ছড়ি মারে। অনেক লোক ছিল, কারও সাহস হ'ল না যে সাদা পাঁঠাকে পাল্টা মারে। বৃদ্ধ বললে, 'হাম সিপাই মিউটিনি মে তরয়াল খেলায়া থা।' মনকে প্রবোধ দেবার মত আর কি ছিল বল? ছেলেরা যখন পড়ে গিয়ে চোট লেগে কাঁদে তখন মাতা বলেন, 'মাটিতে ক্যাং করে গোড়ালি মার!' ছেলে ... লাথি মেরে মন বোঝায়। আমীন বুড়োর রোদে ঘোরবার জন্য একটা সোলা টুপি ছিল। সেটাকে পায়ে করে থেঁতলে ফেলল। একটা সাহেবের মুণ্ডপাত হ'ল।

অনুকম্পা দেখিয়ে আমীন বুড়োকে সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'ভুশচন্দ্ বাবু আপ মিউটিনি মে কয়ঠো সাহেব মারা থা?' বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, 'কয়নেইল, জেনরেইল, কাপ্তান, সয়কড়োঁ সাব শালা নেই চল্‌তা।'

'তব আপসোস কেয়া হায়?'

'কুছ্ ভি নেই,—ছিনরি কে সাঁই শালা হারামীকা পুত! উসকে চাচা-নানাকো হাম পহলেই খতম কর দিয়া।'

কলকাতার সকল কাগজ সোনপুরের ধুমধাম লিখত। বঙ্গবাসী লিখল, 'মা গঙ্গে! দারবঙ্গের সংবাদদাতা যে মহাপাপের কথা লিখেছেন তাহা শীঘ্র ধুয়ে ফেল মা। সোনপুরকে গ্রাস কর মা!' সোনপুরের বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল হ'ল।

যে বাঙ্গালী কেরানীদের কোনও রাজস্টেট থেকে সোনপুর পাঠান হ'ত তারা রঙ্গ ও কেলেঙ্কারি দেখে মজা পেত বটে কিন্তু অপমানিতও হতো। সাহেব মাঠে ঘুরে ঘুরে বন্দোবস্ত করছেন এই, সামিয়ানায় নাচ হবে, এই তাঁবুতে লাট সাহেব এলে খানা হবে, এইখানে মদ থাকবে ইত্যাদি। হঠাৎ লেখবার দরকার হলে বাঙ্গালী কেরানীকে বলতেন, 'বেন্‌ড্ ইওর ব্যাক বাবো!' বাবু পিঠ বেঁকিয়ে সাহেবের দিকে পেছু ফিরে দাঁড়াত। পিঠটা ডেস্কের কাজ করত। সাহেব কাগজ ও খাতা পিঠে ফেলে লিখতেন। হয়ে গেলে বলতেন, 'থ্যাংকস।' আবার দরকার হলে বলতেন, 'বেন্‌ড্ ইওর ব্যাক বাবো!' নীলকুঠেলের অত্যাচার চরমে উঠলো। বিহারীরাও বলতেন 'আব সোনপুর নাশ হোগা।'

পুর্নিয়ার এক বিখ্যাত প্ল্যানটার 'ফরটি ওয়ান ইয়ারস্ ইন ইণ্ডিয়া' বই লিখেছেন মস্ত গোবদা। তাতে লিখছেন যে দুইজন পণ্ডিত ধরা পড়লো তাঁর বাঙ্গলোর রাস্তাতে। এ রাস্তা নেটিভদের জন্য নয়। দুই পণ্ডিতকে পিঠো-পিঠি বসিয়ে হাত বেঁধে দেওয়া হ'ল, টিকিতে টিকিতে গেরো বাঁধা হ'ল। তারপর সাহেব এক চিমটি নস্য এনে দুই পণ্ডিতের নাকে দিলেন।

অ্যালারজি পেশেন্টদের নভেম্বরে যেমন হাঁচি হয়, বেচারীদের তেমনি প্রচণ্ড 'ছিঁক হোনে লাগা।' টিকিতে টিকিতে টান পড়ায়

কষ্ট বোধ হয় দর্পহারী মধুসূদন বুঝলেন ও অবশেষে চম্পারনে এক মহাত্মা পাঠালেন। ভগবানের অফিসও চটপটে নয়, লালফিতা সেখানেও বিরাজ করে।

দশটা বদমাস হাতীকে টিট করে রাখে একটা উট। সেই জন্য পশ্চিমে দশটা হাতীর পাশে পিলখানাতে একটা উট রাখা হয়। বিহারে এক রাজার আশিটা হাতী এক প্রকাণ্ড পিলখানায় এক সঙ্গে থাকত। সেই সঙ্গে আটটা উটও থাকত। হেড মাস্টারকে দেখলে ছেলেরা যেমন চুপচাপ থাকে হাতীরা মোটে ট্যাঁ পোঁ ক'রত না। উটশূন্য পিলখানায় হাতীরা সমস্ত রাত্রি দামাল ছেলেদের মতন উপদ্রব করে, দরজা ভাঙ্গে, দড়ি শিকল ছেঁড়ে, তাড়ির খালি কলসি ভাঙ্গে। মাহুত তো সমস্ত রাত্রি থাকে না।

তেমনি দশটা বদমাস প্ল্যানটারকে টিট করে একটা হাতীর মাহুত। দশজন নীলকুঠেল চারজামা কষা একটা হাতীতে গাদাগাদি করে বসে সোনপুর মেলায় যাচ্ছে। সেখানে অন্য সাহেবের মেমের সঙ্গে তাঁরা নাচবেন। ঘেন্নায় মরি মা, ঘেন্নায় মরি। (মাহুতটা কেমন করে জব্দ ক'রল পরে বলছি)।

কেন, নিজের মেমের সঙ্গে কি নাচতে পার না বাপু? মজঃফরপুর ক্লাব থেকে বড় লোক নীলকুঠেল মনে মনে মণ্ডা খাচ্ছেন 'আমি ক্যালকাটা লেডিজদের সঙ্গে নাচবো' আর কলকাতার সাহেবরা মনে করছেন 'এবারে আমরা হেলদি বিহারবাসিনী মেমদের সঙ্গে নাচবো।'

আর মেম বেটীরাও তেমনি, পরপুরুষের সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচতে উৎসুক। সোনপুর মেলা পাপে ভরে উঠল। তাতেই

নীলকুঠেলরা নরকে গেল। জার্মানীর সিনথেটিক ইনডিগো তারপর বাকীগুলাকে সাবাড় ক'রল। কেউ কেউ অন্য চাষ করলেন। সোনপুরের জন্য যত অবৈধ সন্তান জন্মাল তাদের চাকরি রাজা মহারাজারা দিলেন,—বাধ্য হয়ে। কারণ খোদ ছোটলাট নীলকুঠেলদের সঙ্গে সোনপুরে খানা খেতেন। তাঁর বাসনা এ ছেলেদিকে বিহার পুষুক, কারণ বিহারে তাদের জন্ম। আর তখন তো জন্ম-নিরোধ ছিল না।

যদি মেয়ে জন্মাত তাদিকে বিয়ে করতো অ-বিহারী অ-বাঙ্গালী সুন্দর পুরুষ। তারা ঘরজামাই হয়ে বিহার রাজাদের আশ্রয়ে থাকত। তখন বিহার, বাঙ্গলা, উড়িষ্যা এক ছোটলাটের অধীনে। এই সব যুবাপুরুষ ইংরেজের প্রিয়পাত্র ছিল, কারণ তাদের বাপ-দাদা মিউটিনিতে ইংরেজকে সাহায্য করেছিল। রাজারা লেফটেনেন্ট গভর্নরকে খুশী রাখতেন। শুভবিবাহ করে মেম নিয়ে এক নাক-থ্যাবড়া ব্রাউন চামড়ার জামাই এলেন উত্তর হ'তে। তাঁর টাইটেল ছিল কেরনেন। নাম বলে কাজ নাই। একটা দশ হাজার টাকার বাঙ্গলো, একটা খুব ভাল ট্যানডেম, দুটো ঘোড়া, দুটো সহিস, আর মাসে পাঁচ শো টাকা ভাতা ম্যানেজার হুকুম দিলেন। এই সুখভোগ করবার জন্য অনেক নেটিভ মেম বিয়ে ক'রত। যেমন তেমন মেম হ'ক পাঁচ শো পাবি। কথায় বলে 'যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত।' একটি গতযৌবনা 'সোনপুর সুন্দরী' বিয়ে করে এক দেউলে নবাব মাসে ৫০০৲ ও বাড়ী, গাড়ী পেয়েছিলেন।

এই কারণেই বোধ হয় সাহেবদের বাপের নাম দিয়ে ফরম ভরাতে হয় না। বলডান্স যে কি ভয়ানক জিনিস রেনল্ডসের নভেলে দেখতে

পাই। তাই রেনল্ড্‌সকে আমেরিকায় পালাতে হয়েছিল, তাই তার কেতাবগুলো ১৯১৮ সালে উবে গেল।

ভারতবাসী ও বাসিনীরা কি বলডান্স করেন না! অল্পস্বল্প হয় বই কি। লর্ড কর্জনের সঙ্গে একজন বিখ্যাত ভারতবাসিনী নেচে-ছিলেন। যখন শেষ রাত্রে বাড়ী ফিরলেন দেখলেন শ্বশুর রেগে কাঁই। ছেলেকে যে ধমক দেবেন—'কেন তুই বউকে নাচতে দিলি' আদান-প্রদান অদল-বদল প্রথার জন্য সে পথও বন্ধ! ছেলে স্বয়ং লেডি কর্জনের সঙ্গে ধিন ধিন করে নেচে এসেছেন, মুখে তখনও শ্যামপেনের খুস্‌বু, বউমাও দু-চার ঢোঁক খেয়েছিলেন। অথচ মালটানা কখনও জানতেন না। বড়া ঘরানার রাজা-বাদশা যদি লেডি কর্জনের সঙ্গে না নাচেন, তবে কি আমরা ছেঁড়া গেঞ্জি অঙ্গে, তালিমারা চটি পায়ে গেরস্তর ছেলে লাটগিন্নীর সঙ্গে নাচতে যাব?

সোনপুর বা হরিহর ছত্রের মেলা মদের জন্য বিখ্যাত। মেলার পর হাজার হাজার খালি বোতল,—লম্বা, চ্যাপটা, চৌকো, গোল নিলামে বিক্রি হ'ত। সিগারের ছাই ঝাঁট দিয়ে ফেলতে ১০টা হুইল ব্যারো লাগতো। পাঁড় মাতাল যেত সেখানে। 'শরাবী নেশাবাজ অংরেজোঁকি নাচঘর হ্যায় সোনপুর'—পাটনার লোকে বলতো। কলকাতার ময়দানে স্কেটিং রিঙ্কের যে বদনাম ৫০ বছর বা ৬০ বছর আগে শোনা যেত সে তো কিছুই নয়।

'সোনপুর মীট' নাম ছিল। কলকাতা ও লখনউ থেকে স্পেশাল ট্রেনে রেস হর্স যেত। বড় বড় জুয়াড় হাজির হ'ত, বেটিং রিং গম গম করতো, হাঁকতো 'টু টু ওঅন অন কিং জর্জ, থ্রি টু

ওঅন অন লর্ড হ্যারি'। ছোটলাটও মেলায় হাজির থাকতেন। কোন্ না বেটিং রিংয়ে খেলতেন।

বিহারের রাজারা গাড়ী, ঘোড়া, কানাত, তাঁবু, সামিয়ানা, কেরানী পাঠাতেন, মধ্যে মধ্যে বিরক্তও হতেন। কেলনার গ্রেট ইস্টার্ন কেটার করত। 'সোনপুর' বললে তখন সাহেবের মেলাই বোঝাত। রাজার পোরটুগীজ ব্যাণ্ড-মাষ্টার তাঁর চমৎকার ব্যাণ্ড নিয়ে সোনপুর যেতেন। রাজার জন্য সাহেব তরে যেত, সাহেবের জন্য রাজা রাজ্য করতেন। উভয়ে উভয়ের কৃপাপ্রার্থী।

আর এখন? হাতী, ঘোড়া, গরু, বলদ, ভঁইস, খচ্চর, উট বিক্রি হয়। সোনপুরের প্ল্যাটফরম নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা। মেপে কে দেখতে গেছে বলুন? বিলাতী ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল। বিলাতী কাগজে তখন 'সোনপুর মীটের' খবর বেরুত। এখন হাজার খানিক একা ধূলো ওড়ায় ও মোশাফিরদিকে চেঁচিয়ে সাবধান করে— 'ধাক্কা! ধাক্কা! ধাক্কা!'

প্রায় পাঁচ শ হাতী জমা হয়। যে হাতীগুলো পাটনা থেকে অনিচ্ছায় সাঁতরে ওপারে যায়, তাদিকে মাহুত বেশ খোসামদ করে—'হিলো মেরে বেটা বিল বাহাদুর! দো ঘইলা তাড়ি পিলা-ওয়েঙ্গে'। হাতী মাহুতের হিন্দী ও কোড ওআর্ড সব বোঝে। ওপারে সোনপুর; লক্ষ তালগাছ। সেখানে তাড়ি পাবে এই লোভে হাতী একটু দ্বিধা করে জলে ঝপাত করে নাবে; কি উত্তাল তরঙ্গ! নভেম্বরের পাটনার গঙ্গা বড় কেওকেটা নয়। জল বরফের মত ঠাণ্ডা, আর ঝিরি ঝিরি করে শীত পড়ে আসছে আর 'পছিয়া বহত হায়।' গঙ্গা পার হতে হাতীর যাট সত্তর মিনিট লাগে। নভেম্বরের

বর্ষার জল থই থই করে।' হিন্দুস্থানীরা বলেন, 'পানিয়া নেহাইত দল মন বি, হাথি তো সাহেব কমল কিয়া' (অবাক করেছে এত জলে সাঁতরে)।

যদি হস্তিনী জলে নামলো তার বাচ্চাটা নেঙ্গুর নাড়তে নাড়তে মার পেছুতে ডুবল। সব দেহটাই জলের মধ্যে কেবল মুণ্ড একটি, দুটি চোখ ও শুঁড় উঁচু হয়ে আছে। কোন কোন মাহুত হাতীর পিঠে পার হয়। শীতকালে পারে না। হাতী একলাই যায়। বুদ্ধিমান জানোয়ার।

গঙ্গায় নামবার আগে হুঁসিয়ার হাতী দর্শকদের দিকে তাকিয়ে শুঁড় বাড়ায়। কোন হিন্দুস্থানী জোয়ান তার প্রকাণ্ড লাঠি দান করে। শুঁড়ে লাঠি ধরে চোরাবালি আছে কিনা হাতী মাটি টিপতে টিপতে যায়। একজন উড়িয়্যাবাসী দেখে বললেন, 'হথী শুনডে দণ্ড ধরিকিড়ি যাউছি, একি গধা অছি?'

দশটা নীলকুঠেল হাতীর মাহুতকে বললেন, 'সিধা সড়কসে চলো! উধার পাল্লা পড়ে গা।' মাহুত কিছুতে শুনছে না, সেই ঘুর পথ নিরাপদ ভেবে সেই দিকেই যাচ্ছে। 'সন অভ এ বিচ! ব্লডি ফেলো!' সাহেবদের নাচে পৌছতে দেরি হচ্ছে তাই এত তাড়া। সাহেবরা মিলে মাহুতকে ঠেলে হাতীর গলা থেকে নীচে ফেলে দিলে, ও লোহার 'গজবাজ' হাতে নিয়ে একটা সাহেব হাতী হাঁকাতে লাগল।

সাহেব হাতী হাঁকাতে জানেন, কিন্তু হাতীর কোড ও ভাষা বলতে পারেন না। মাহুত ভাবল যে, এই জঙ্গলে একলা কি করে রাত কাটাবে। তাই সে চিৎকার করলে, 'মইল্ মইল্।' এই কোড শুনে হাতী থেমে গেল, হাঁটু গেড়ে বসল।

সাহেবেরা যতই ডাঙশ মারুন না কেন, হাতীর নড়ন চড়ন নেই। অগত্যা আবার মাহুতকে খোসামদ করে হাতী চড়তে হ'ল। তা না হলে মেমের সঙ্গে নাচবেন কি করে? আপদ বিদেয় হয়েছে —আবার না আসে।

সেকালের 'পঞ্চানন্দ' পাঁচু ঠাকুর (ইন্দ্রনাথ বাড়ুয্যে) লিখতেন। কোন কেলেঙ্কারি 'বঙ্গবাসী'তে বর্ণনা করবার আগে বলতেন 'কহ দেখি কালামুখী কলম আমার!' কেলেঙ্কারি করে একজন আর কালামুখী হয় কলম বেচারী এবং যে সেই কলমে লেখে সেও কালামুখো।

পরের কলঙ্ক খুঁড়ে বের করতে এত আনন্দ কেন? পরের পাপ-জীবনের বোঝা লাঘব করবার জন্য। নিজের 'কনফেশনের' মতন এটা সমান প্রায়শ্চিত্ত। ফ্রয়েডিয়ান স্কুল বলেন, 'পরের পাপকে নিজের ভাবি ও ব্যথিত হই।' মানুষ চায় না যে পরে ও পাপ করুক। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'এই স্থির গঙ্গার বক্ষে যদি এ বোঝা নামাতে পারি তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?' পরের পাপের জন্য মহাত্মা নিজে উপোস করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেন। যীশু পরের পাপ ধুতেই এসেছিলেন। মা গঙ্গা পরের পাপ ধুয়ে ধুয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। 'ইল্লৎ না যায় ধুলে' প্রবাদ গঙ্গাকে নিরাশ করে না।

১৩৫৯

এলাহাবাদ অন্বেষণে

এ সময়ের কালোচিত প্রশ্ন সকলের মুখে—এলাহাবাদ কেমন জায়গা? গেলে ফিরে আসবো তো, না প্রাণটা শীতে সেইখানেই দিয়ে আসতে হবে? সে শহর কি রুক্ষবক্ষ তপ্তমরু, না কি শীত-শীতলিত হিমালয়? যিনি এলাহাবাদ দেখেছেন তিনিও এটা ভাবেন, যিনি দেখেন নি তিনিও ভাবেন। যিনি পৌষ-মাঘে গেছেন তিনি ভয় খান, যিনি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে গেছেন তিনিও। যাঁরা বাসিন্দা বাঙ্গালী তাঁরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটান।

গরম ও ঠাণ্ডা এই দুই পরম শত্রু। এই দুই দুশমনকে আলিঙ্গন করে বহু কাল এলাহাবাদে কেটেছে। গয়া দিয়ে গেলে মাত্র ৫১৪ মাইল, পাটনা দিয়ে ৫৬৪।

খাবার পরবার প্রভুভক্ত চাকরের কি একটা আকর্ষণ ছিল, বৃহৎ তৃণাবৃত কম্পাউণ্ডওয়ালা 'বাঙ্গলায়' বাস অতি আনন্দদায়ক বোধ হত। বাউরচিখানা থেকে আট টাকা মাহিনার জেসেয়ারা জাতের হিন্দু বাউরচির কাটলেটের তীব্র খুশবু আসত। ঝুম ঝুম করে সাউথ রোড দিয়ে একা চলেছে, মাঝে মাঝে "বগ্‌গি (ঘোড়ার গাড়ী) বা কচিৎ একখানা মোটর। সাঁই সাঁই করে "ওআন অপ" গাছের ফাঁক দিয়ে যাচ্ছে, দেখা গেল। ঐ "টু ডাউন" ডাক-গাড়ি, কুড়িখানা ফোর-হুইলার তখনকার খর্বাকার চিমনি মণ্ডিত এনজিন, বন বন করে বেরিয়ে গেল।

বিশ্বাস কটাক্ষে এলাহাবাদকে দেখল এই ধূলি-আবরিত কনকনে, বায়ুতাড়িত শহরখানির কি এক মোহিনী শক্তি আছে যা আমাকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী টেনে রেখেছিল। বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে, আট আনা মাহিনার দুটি ছোঁড়া ডান পা বাঁ পা টিপচে, সিগ্রেট খেতে খেতে ভাবছি আমি কি নর্থ পোলের রাজা, না কি চ্যাম অব টারটরী ?

যাঁরা এলাহাবাদের গন্ধানালা নামক স্থানে বাস করেন তাঁরা এলাহাবাদকে 'ফকিরাবাদ' বলেন,—অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত দরিদ্রের শহর। যাঁরা ক্যানিং রোডে বাস করেন তাঁরা এলাহাবাদকে 'শাহজাদাবাদ', বা রাজপুত্রদেব শহর বলেন, কেউ ধুলোর নিন্দা করলে বলেন, "গাধা ক্যেয়া জানে জাফরান কি কদর ?" 'কানপুর' রোডে জুন মাসে চাঁদের আলোয় কম্পাউণ্ডে সাহেবরা গেঞ্জি খুলে ফ্যাকাশে পিঠ বের করে ঘুমুচ্ছে, যেন সাঁতবাগাছির ওল, বিক্রির জন্য গড়াগড়ি দিচ্ছে।

এলাহাবাদ অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখছি এই স্থানটিতে রামচন্দ্র, বারনিয়ার, ট্যাভরনিয়ার নেমেছিলেন, ও এর নাম "এলাবাস" এবং "হেলাবাস," শেষোক্ত দুজন দিয়ে গেছেন। তখন থেকে সাহেবেরা ভুল উচ্চারণ করেই আসছে, বলে "অ্যালাবাড," লেখে "অ্যালাহাবাড"। সেখানকার হিন্দু-মুসলমান বাসিন্দারা প্রায়ই "ইলাহাবাদ" বলে, বাঙালীরা "এলাহাবাদ" বলে। এর রেলওয়ে চিহ্ন হচ্ছে ALD। রাষ্ট্রভাষা পরিষদের সমস্ত কেতাবেই "প্রয়াগ" লেখা হচ্ছে।

এর আসল নামই প্রয়াগ। জনসাধারণ "পৈরাগ" বলে থাকে। প্রয়াগ নাম এখন একটি স্থানে সাইনবোর্ডে বজায় আছে অ্যালেনগঞ্জ বা "প্রয়াগ" স্টেশন।

বাঙালী ভদ্রলোক অনেকে প্রয়াগলাল নাম ধরেন। হিন্দী উচ্চারণে 'য়া' প্রায় লোপ পায়, 'প্রাগদাস কি দুকান' 'প্রাগওয়াল কি হনুমান'। নেহরু যখন Prague-এ গিয়েছিলেন সেখানে ঐ শহরের উচ্চারণ 'প্রাগ' শুনে বলেছিলেন, "ঠিক আমার ইলাহাবাদের মতন উচ্চারণ!" এঁর পৈতৃক বাড়ির নাম "আনন্দ-ভওয়ন" এলাহাবাদ অ্যালফ্রেড পার্কের পূর্বে।

বাড়িখানি রাজপ্রাসাদ, দারভাঙ্গা (লাউদার) কাস্‌ল ও রেওয়া বিল্ডিং অপেক্ষা রমণীয়। 'মিলিটারী ব্যারাক ও অন্যান্য বাড়িও অতি বৃহৎ ও সুন্দর দেখতে। সাহেবী আমলের বিলুপ্ত লরীজ হোটেল, মিওর কলেজ, ইউনিভারসিটির বাড়িগুলি ও সুন্দর চার্চ, শহরের শোভা বৃদ্ধি করেছে। দেশী পাড়ায় নতুন নতুন চিমনিওয়ালা বাড়ী তৈরী হয়েছে। আগুনের গঁড়সীর (বেহার বঁড়সী) পাঠ উঠে যাচ্ছে। নেপালের রাজবাড়ী গঙ্গার জল থেকেই উঠেছে। ক্রিশ্চান কলেজ যমুনার ধারে। বন্যার সময় শহর ত্রাসিত, বিচলিত।

রেল হবার পূর্বে যাঁরা স্বাস্থ্য-অন্বেষণ বা অভাবের তাড়নায় বাঙলা দেশ ছাড়তেন, খুঁজে খুঁজে এলাহাবাদ বেশী পছন্দ করতেন। সে কোথায়, কতদূর, কথাবার্তা চলত, তারপর স্টিমারে রওনা হতেন। এক সপ্তাহ লাগত। যমুনার যে ঘাটে কলকাতার স্টিমার লাগত, সেটা এখনও দেখে চেনা যায়। ১৯০৯ সালে ঠিক সেই জায়গায় "ওয়াটার শুট" তৈরী হয়েছিল। পাড় থেকে তেলা হড়হড়ে ঢালু পথ জল পর্যন্ত তৈরী হল। ছোট ছোট নৌকা পাড় থেকে ঠেলে দিলে যাত্রী সমেত হড়াৎ করে যমুনার জলে পড়ে "হতু" যেত।

যমুনার তীরে শীতকালে কর্কশ ঠাণ্ডা ঝড় বয়। গরম পড়লে সেই হাওয়া আগুনের মতন বোধ হয়। "ধীর সমীরে যমুনা তীরে,

বসতি বনে বনমালী” কবির কল্পনাপ্রসূত সংগীত। শীতে তীব্র বাতাসে হৃৎস্পন্দন বন্ধ, গরমে লুয়ের চঞ্চল ব্যজন এবং সড়কে পিয়াসা মিছিল “হায় রাম পানি দে!”

আর না হয় তো সেকালে স্বাস্থ্য বা আবহাওয়া অন্যরকম ছিল। এত শীতে, এত গরমে যৌবনেই এলাহাবাদ বাঙ্গালীর সহ্য হয়, যখন “ডগ মগ তনু রসের ভরে” (বিদ্যাসুন্দর)। এক কল্পবাসিনী বৃদ্ধা জব্দ হয়ে বলেছিলেন “পৈরাগের গৈরব, মান, সৈরভ যৈবনেই মিলে।” “কৈতুকে” প্রয়াগের বাঙ্গালী বুড়িরা পটু। এলাহাবাদে আমাদের উলোর বাঙ্গাল বুড়ি বলত—

“আজ বড জাড়, বুড়োর ভাঙ্গে ঘাড,
কচির বুক দুড-দুড করে,
যুবোর গোঁফ ছিড়তি নারে!”

সেকালে এলাহাবাদে সুখ-দুঃখ অন্বেষণ করতে গিয়ে নবাগত ভদ্রলোক বাঙ্গালী (রোগী বা কর্মপ্রার্থী) দিনকতক ঘুরে ঘুরে বেড়াত। স্টেশনে বিশাল ছাতার মতো নিমগাছের তলায় পাঁচ-পো মোটা জোয়ান মুসাফিরের সঙ্গে পড়ে থাকত। কোনও দয়া-বিচলিত বাসিন্দা বাঙ্গালী যদি একমুঠো খেতে ও একটা ডাক্তা খাটিয়া দিত তাহলেই এই রাজধানী শহরে প্রবাসের বীজে অঙ্কুর জন্মাত। এই রকমে বহু বাঙ্গালী আইন ব্যবসায়ী বা জমিদার বা কনট্রাক্টর হয়ে টাকার লালসা মিটিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন শহরেও ছড়িয়ে পড়তেন। দুইজন ধনী ব্যবহারজীব আমাকে বলেছিলেন (১) “ডাক্তার বলল কলকাতা থেকে পালাও, শুখনো দেশে যাও, তা নইলে আবার কারবংকল্ হবে”। (২) “রাস্তার ল্যাম্পে লেখাপড়া

করতাম, পকেটে চানা মাত্র আহার, এক মকদ্দমায় হঠাৎ নাম হ'ল, এখন সি, পি-র লাটসাহেব শেকহ্যাণ্ড করে!" এত সুখস্বপ্ন অবশ্য সকলে দেখত না, দোকানে খাতা লিখে ডাল-রোটী পশ্চিমা বাতাস অভ্যাস হলেই কূলপ্লাবী গঙ্গা যমুনা দেখে চক্ষুর পরিতৃপ্তি ঘটত।

কলকাতার আশেপাশে "ভিলা"গুলাতে ৪৬ সালে যে রকম গলাকাটা হয়েছিল তা দেখে এলাহাবাদের ইংলিশ কোয়ার্টারের উপর অভক্তি জন্মেছে। সাহেবপাড়ায় এলাহাবাদে খোলা 'বাঙ্গলায়' বাগান-বাগিচা ভোগ করার ভ্রান্তধারণা ডাইরেক্ট অ্যাকশনে কেটে গেছে; শহরের দোতলা-তেতলাই দাঙ্গার সময় নিরাপদ। সার যদুনাথকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এলাহাবাদের ও আমাদের দেশের বাড়ির সিঁড়ি অত সরু কেন, ধাপ এত উঁচু কেন? ঐতিহাসিক কারণ কি?" উত্তর দিলেন, "প্রত্যেক বাড়িই একটা কেল্লা, শত্রু উপরে ওঠবার সময় উঁচু সিঁড়িতে বাধা পেত।" এখনও এলাহাবাদে চোর এলে বলে "সিঢ়িসে ঢাকেল দেগা হারামীকে পুত।" একবার একজনকে দোতালা থেকে "ঢাকেল" দিলে সে বল্লম সমেত গড়াতে গড়াতে উঁচু সরু স্টেয়ারকেস দিয়ে রাস্তায় পড়বে।

ইংলিশ কোয়ার্টার ছেড়ে দেশী 'নেটু' (নেটিভ) পাড়ায় বাস করারও অনেক সুবিধা। ১৮৯৫ সালে দু-পয়সা সের দুধ সামনে দুয়ে দিত, রাবড়ি ।৵০, "ওয়ালাই" (যাকে বাঙ্গালীরা মালাই বলে) ৬০ সের, মটন ৶০, একটা ইলিশ ৴০। "লে ঝিঙা মছলিরে!" ঝিংড়িওয়ালী ঝুন মাসে হাঁকে। বাঙ্গালীর দল তার পেছু ছোটে

বছরে একবার চিংড়ি খেতে। যমুনা শুখুলে চিংড়ি বালির ওপর খেলা করে বেড়ায়।

বড় রাস্তায় (হিউএট রোড বা সিটি বা জনসেনগঞ্জ) ভোর থেকে ভিখারী ও ফেরিবালা হাঁকচে, "ঘড়ি ঘাড় কি খয়ের! উঠো শোনে বালো! মনদিরমে পুরোহিত কো হামনে জাগায়া, মসজিদমে ইমাম কো হমনে উঠায়া!" হালুয়ে লুচুই! গুলগুলি গুলগুলে! পাস্তি কি চাট্! (এত মিষ্টি তেঁতুল দেওয়া মটর আলু যে ওরেঁ ছেলে, পাতাটাও চাটবি), আগ্রেকি জেলেবী! পেড়োঁ মথুরে ওয়ালোঁ! লে রহ মছ! বথুইকে শো! (পাটশাক); পাইকে মটর!" (আধ পয়সার লুচি আধ পয়সার মটর)।

গঙ্গার ওপারের গ্রাম থেকে ছানা, খোয়া আসত তিন আনা সের। "সট্টীর" (হাটের) মূল্যে আলু পেঁয়াজ এক পশরিতে পৌনে সাত সের, শহরে পাঁচ সেরে পশরি।

রাস্তার মেলা, প্রসেসন, রামলীলা লেগেই আছে, গুড়িয়াকে মেলা (পুতুল বিক্রি), শ্রীকোটীকে মেলা গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সেজেগুজে গান গাইতে গাইতে চলেছে "ছটে", আগে আগে এক "মেহরা" (মেয়েদের সর্দার বা মেয়েমুখো পুরুষ) একটা কানে হাত দিয়ে গান বলছে, মেয়েরা সেই "ধুয়ো" ধরছে "কাহে মাচাওয়ে শুল, পাপীয়া! কাহে মাচাওয়ে শুল?" এক দাড়িবালা হাঁকছে "দীতাবো শুনাবো কি তামাশে!" ননদ-ভাজের ঝগড়া হাতে পুতুল নাচিয়ে দেখাবে ঝুঁটি ঝুঁটাঝুঁটি, ঝুঁটি ধরে লড়াই।

অর্দ্ধ্জিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে যখন মোছ উঁচু করে টেড়ি বাগিয়ে

"মেহরা" ঈষৎ নেচে পথ চলে তখন দোতলা-তেতলা থেকে লোকে তাকে ঠাট্টা করে।

সিপাহীকে পাহ্‌রা
মেরাক্ন কি মেহরা

অর্থাৎ সর্দার যেন সেপাইয়ের মতন ধন-দৌলত পাহারা দিচ্ছে।

দিল্লীর বাই, তিনটে ভেড়ুয়া পেছুতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। যেমন তাকালাম, নর্তকী "বাবু নাচ দেখাবো? বলে পলকপাতে "কাটারি মেরি সৈঁইয়া" সুর ধরে ক্ষিপ্রপদে তেড়ুড় ভেড়ুড় হয়ে নাচতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ুয়ারা তান্ তান্ চাঁটি মারল, ক্যাঁও ক্যাঁও করে সারঙ্গ বেজে উঠ্‌লো, পঞ্চাশটা লোক ঘিরে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে নিলাম কষ্টে হাসি চেপে। গান-বাজনা থামলো; ছুঁড়ি লোকের দিকে তাকিয়ে আমাকে ধিক্কার দিল "হায় রে পয়সা!"

সে সময় ব্যাগপাইপ ব্যাণ্ড লোয়ার-কোর্টের ময়দানে হাজির থাকত। একবার একটা মকদ্দমা জিতে বেরিয়ে আসছি অমনি দেশী ব্যাণ্ডমাস্টার স্যালিউট করে আমার ছ্যাকড়া গাড়ির পেছু পেছু বাজাতে বাজাতে সব ব্যাণ্ডস্‌ম্যানদের নিয়ে চলল। "এহি রেওয়াজ হৈ!" লোকে বলে। আমার চাকর ব্যাণ্ডকে চার আনা দিল।

চৌকে সন্ধ্যার সময় কি ভিড়! উট, সোয়ার, হাতি, ডোলী, পালকি, একা, টাঙা, ফেটন, "বগ্‌গি" চলেছে, ওয়ানওয়ে ট্রাফিক। সেকালে মোটর কম। শেখ সৈয়দ, মোগল, পাঠান, বাঙালী, মাদ্রাজী, কাশ্মীরী, সাহেব, মেম বৃথা ভিড় করছে, উট, খচ্চর, পাগড়ি, তুর্কী টুপি দেখলে ঠিক কথতে পারি না এটা মক্কা কি টেহরান কি ইস্তাম্বোল, কি মর্থ-

ও:য়েট প্রভিন্সের রাজধানী এলাহাবাদ। বাঙ্গালী ভিখারিনী হাত পেতেছে, আর একটা হাত মুখে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে সমস্ত দিনের অন্নাভাব। কলকাতায় বাঙ্গালী ভিখারিনী দেখলে তো প্রাণে এত বাজে না, বিদেশে দেখলে 'ঢেঁকির মুষল পড়ে বুকে যেন।' ভিক্ষার লোভেও কি বাঙ্গালী এই তীর্থরাজ এলাহাবাদে ছোটে ?

মিউনিসিপ্যাল বোর্ড চৌকের রূপজীবাদের দু ক্লাসে ভাগ করেছেন —'গাহতি হৈ' এবং 'কামাতি হৈ'। শেষোক্ত দলকে পুলিসে অর্ধচন্দ্র দেয়। প্রথম দল দোতলার বারান্দায় বসে সড়কের আদমীদের গান শোনায়। 'চৌক গীত সে ভরি হুই হ্যায়।'

হোলিতে জনসেনগঞ্জ রোড দিয়ে গাধার প্রসেশন যেত।' বৃদ্ধ ধোপাবা মদ খেয়ে লেজের দিকে মুখ করে গাধায় চড়ে গাইছে 'ডোলে রে, যৌবনওয়া'। পিউরিটি পার্টির প্রসেশনও চলেছে গাইতে গাইতে—

রাম লছমন দোনো ভাই
হাত চটাপট্ করে লড়াই

অর্থাৎ বাল্যকালে দুই ভাইয়ের খেলা। রাস্তার ভিড়ের সহানুভূতি ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ ধোপার মুখে যৌবনের গান। পিউরিটি পার্টির প্রেসিডেণ্ট গাধার 'ভুঁচ্‌চি! ভুঁচ্‌চি!' ডাকের সঙ্গে যৌবন দোল খাচ্ছে গান শুনে হেসে ফেল্‌লেন। তার দলের লোকরা নেতার গাম্ভীর্য শিথিল হল দেখে গাধার সঙ্গে ছুটলো গর্দভ রাগিণী গাইতে গাইতে—

'মজা করে বুঢ়ো গাধ্‌ধে পর
যোয়ানী মিলি এক চোয়ানী ভর!

২

অতি দরিদ্রও হোলিতে বছরে দূর দেশে একবার মিষ্টিমুখ করবে বলে এক মাস পূর্বেই গান ধরে—

পাও ভর্ শত্তুয়া
অধি পাও গুড়
আওয়ল হোলি
যাওয়ব দূর।

ইংলিশ কোয়ার্টারে নানান মজা। সব জিনিসই কম্পাউণ্ডে বিক্রি করতে আসে, সবজী, আণ্ডা, মটন, মাখম, কেক, রুটী, হরিণের নীলগাইয়ের ময়ূরের মাংস। ফরচুন-টেলার হাঁকছে, 'মেজ খুরসি প্যালিশ!'

মাঝে মাঝে উপসর্গ ঘটে। রাত্রে এক বাঙ্গালী ডাক্তার গাড়িতে এক মেম নিয়ে হাজির। 'একটি ঘর খালি থাকে তো দিন, মেম রেল থেকে নেমেই প্রসববেদনায় কাতর।' ঘর-ভাড়া ও জিনিস ধার দেওয়া রেওয়াজ ছিল। রুশ, বেলজিয়ান রমণী, বারমিজ। ইংরেজ, ট্যাস, আমেরিকানও আসতো। একটি মেমের অন্যায় আবদার—'ব্যাবো! তোমার ক্ষুর দাওং ও কাঁচি দাও, কাল ফেরত দেব। কোদাল কুড়ুল দাও, পরশু দেব।'

নানান জাতের চাকর কাজ খুঁজছে। 'লালবেগী' (আধা চামার আধা মেসতর), 'শেইখ' (আধা ডোম আধা মেসতর)। বলে, 'খানা ভি পাকায়ে গা, কুমোড ভি সাফ করেগা।' বর্ধমানে বাগদীও সাহেবের রাঁধে। এখন হরিজন গুরুজন। পঙ্‌ক্তি ভোজন চলে।

এলাহাবাদে আমীর আদমীও একা চড়েন, ঘরের একা, চাকায় রুপার নকশা করা আছে। এই নকলে ভাড়াটে একা রুপায় চিত্র-বিচিত্র—'

বেশী ভাড়ায় হাওয়া খাবার জন্য বৈকালে চৌকের স্ট্যাণ্ডে পাওয়া যায়। বাদরিয়াবাগ দিয়ে বন্ করে 'বুলেবাজ' ঘোড়া আপনাকে চার আনায় ত্রিভুবন দেখাবে। তাকিয়া, ঝালরওয়ালা ঘেরাটোপ, পর্দানি ধপধপে, গদদা বিছানো আছে। গুড়গুড়িটি টানতে টানতে যাবেন। সাহেবরাও লুকিয়ে বাজারে এক্কা চড়ে, জনানা পরদা ফেলে দেয়, এবং এক্কাকে মর্যাদা দেবার জন্য তখন এক্কাবালা তার এক্কাকে 'টাঙ্গা' বলে, সাহেবরা 'জিংলার' বলে, কারণ ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা 'জিঙ্গল' শব্দ করে।

রামঘাটে চান করা ভারি মজার। শত শত কচ্ছপ পায়ে সুড়সুড়ি দেয়। কলকাতার বাঙ্গালী গিন্নী একটি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় উঠে বললেন, 'পিসি গো, আমাকে কাতুকুতু দিয়ে মারলে!'

গঙ্গা যখন গরমের দিনে শুখোয় সেই বালির অসীম বিস্তারের উপর আম বিক্রি হয়। সেকালে এক পয়সায় ১২টা দেশী আম পাওয়া যেত। ১৬০টা আমে ১০০ ধরা হয়। তাকে এক 'গাহি' বলে। গঙ্গাস্নানের পরে আম কেনাই মস্ত কাজ।

গঙ্গা পার হয়ে ওপারে পিকনিক করা আমাদের বাতিক ছিল। চার পয়সা নৌকা ভাড়া। একবার বর্ষাকালে একলা ঝুসি থেকে ইংলিশবোটে রাত্রে ফিরছি। চারজন রেলওয়ে মাল্লা দাঁড় টানছে। বি. এন. ডবলিউ পুল তখন তৈরি হচ্ছে। গঙ্গা এক মাইল দু ফার্লং চওড়া সেখানে। এমন বিপদে কখনও পড়ি নি। স্রোত টেনে নিয়ে চলেছে। দু-ঘণ্টা পার হতে লাগলো। পৌছে 'গঙ্গামায়ী কি জয়।' মাঝিরা বলল। কিন্তু প্রচণ্ড শীতেই আমরা বেশী গঙ্গাপার হতাম। "পছিয়া' হাওয়ার অবারিত গতি, ধূলার বাধাহীন মহোৎসব।

গরমিকালে ছাদে বা কম্পাউণ্ডে রাত কাটানো প্রথা। জুন মাসে প্রখর গরমে নৈশ নীলাকাশের তলায় কম্পাউণ্ডের চবুতরায় বসে গিন্নীর তৈরি গোলি কাবাব দিয়ে রোটী খান, রাবড়ি হাপুস করে হাপরান, ল্যাংড়াকে নিষ্ঠুরভাবে কামড় দিন। মধ্যবিত্তের এ আনন্দর কাছে চৌকের 'লালা' 'শেঠ' 'জহুরী' কুবেরগণের স্বর্ণ মুদ্রার রাশি 'স্রেফ বাতে হ্যায়' (বঞ্চকের বাক্যপ্রণালী মাত্র)। তবে এলাহাবাদের উপর এত ভাবান্তর ঘটে কেন?—গরমে মাথা ঘোরে 'লু' লাগে বলে? ভোগে এত অপ্রীতিকর ক্লান্তি কেন, শীতে ঠোঁট ফাটে বলে? ইলাহাবাদ কি হাথী ঘোড়ে খেলতা হৈ কুঁদতা হৈ, শহর কি পিকচর গৈলরী আপকো সামনে পেশ কিয়া। আপকে রায় কি লিয়ে য়হ বাতচিত কাফি হৈ।

বাঙ্গালী অবাঙ্গালী অনেকেরই ঠোঁট ফুটিফাটা সেই শীতে। সন্ধ্যা হবার ভয়ে গঙ্গার অনন্তচড়ার বালির ওপর আমরা রেস করছি রাস্তায় পৌছে ঘোড়াবগাড়ি ধববো বলে। এক বাঙ্গালী স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে ছুটেছেন। হঠাৎ সকলকে অপেক্ষা করতে বললেন,—একসঙ্গে যাওয়াই অপরিচিত বাঙ্গালীর বিদেশী এটিকেট। ভদ্রলোকটি পকেটে ভ্যাসিলিন শিশি আনতে ভুলেছেন। তাই দাঁড়িয়ে স্ত্রীর খোঁপাতে ঠোঁট ঘষলেন পিতা-পুত্রে। হিন্দুস্থানী একজন বললে, 'বাঙ্গালী ওঠমে লেপ চড়াতেঁ হৈঁ' (প্রলেপ দিচ্ছেন)। একজন বুড়ো বাঙ্গালীও তাঁর মোটা ঠোঁট নিয়ে ব্যাকুল, 'মোশায় খোত্ গেলো!' পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটির এত সরল মন যে বৃদ্ধকে বললেন, 'আসুন না,—আমার স্ত্রীর খোঁপায় ঠোঁটটা ঘষে নিন।'

১৩৬০

মাঘে প্রয়াগে

এলাহাবাদের সিটি রোডে ও চৌকে হুলস্থূল পড়ে গেছে; সাদা ধুলোয় দেশে কি ধুলোই উড়িয়েছে। কে উড়িয়েছে? লক্ষ লক্ষ গাঁওয়াইয়া জোয়ানরা, গ্রাম থেকে সাদা কুর্তা পরে এসেছে, মাথায় সাদা পাগড়ি, কাঁধে লাঠি, তাতে একটা ছোট বোঁচকা ঝুলছে। সব একরকম সাজ।

প্রয়াগ স্টেশনে, এলাহাবাদ সিটি স্টেশনে ও আসল খোচপুরুয়া বৃহৎ ই-আই-আর স্টেশনে দেদার মেলা ইসপিসিল "ভক ভক" আসছে। বড় বড় শহর থেকে মুসাফিররা নেমে এলাহাবাদের রাজপথে নাগরা দিয়ে ধুলা ওড়াচ্ছে। এক একটা নাগরা "পাওভর তেল পিতা হায়। তব মোলায়েম হোত হায়।" কেউ কেউ নাগরা কাঁধে নিয়েছে লাঠিতে বেঁধে, বলে "জুতা কাটতা হায়!" আধখানা বলদের চামড়া বোধ হয় দুপাটি নাগরায় লেগেছে।

কুড়ি বৎসর ধরে মাঘ, কুম্ভ, অর্ধকুম্ভ মেলা দেখেছি। ভ্যাগাবণ্ডের মত সস্ত্রীক ও দলবল সহিত নৌকা করে সঙ্গমে নেমে আসল স্থানে ডুব দিয়েছি। একবার যেমন জলে নেমেছি একটা প্রকাণ্ড টিকিওলা ডুবো মানুষের মুণ্ড জল থেকে উঠল। যেন এক টরপেডো কাছে এল—একটা ব্রাহ্মণ। (এইখানে গঙ্গার হলদে রেখা ও যমুনার সবুজ রেখা ই-আই-আর যমুনা ব্রিজ থেকে বোঝা যায়)।

"এ বাঙ্গালীবাবু, গঙ্গামায়ীকি পাওভর দুধ ঔর এক ছটাক চিনি দিজিয়ে।" পণ্ডিতজী জলদেবতা; এক দুধের বোতল "কাছনি" থেকে

বের করলেন ও একটা চিনির শিশি। "কাছনি" মানে কাছা। আমি এক আনার দুধ ও দু পয়সার চিনি কিনে গঙ্গা জলে ঢেলে দিয়ে রক্ষা করলাম। "কিঞ্চিৎ দেব বঞ্চিত করবো না" হচ্ছে তীর্থস্থানের ব্যবস্থা। দুধেই তো জল মেশানো প্রথা শুনেছি। জলে যে দুধ মেশাতে হয় জানতাম না। প্রথম, অপরাধের দ্বিতীয়টা প্রায়শ্চিত্ত না কি? যত দেশের হিন্দুস্থানী বীর পুরুষ মেলা দেখতে আসে। কারও কম্বল নেই। চাবেনা খোরাক মম মাঠে শুই আমি, আমি কি ডরাই সখি ভিখারী শীতেরে?

তারা বাঙ্গালীর মতন শিঙ্গিমাছের ঝোল ও পটল খায় না, তারা ধূলি পটলকেও ভয় খায় না। গোঁফ সাদা হয়েছে যেন ময়দা মেখেছে। "তুমি বুঝি রেসকোর্স থেকে এলে?" কলকাতার রাগী গিন্নী কর্তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কারণ রেসকোর্সের ধুলোও গোঁফে চুলে কোটে ধরা পড়ে। তেমনি এলাহাবাদের গিন্নী কর্তার গোঁফ দেখে বলেন, "বেণীঘাট গিছলে?" ভাগ্যিস বর্ধমানে মেলা হয় না,—তাহলে আমাদের গোঁফ রাঙ্গা মেরে যেত। অসংখ্য চিহ্নিত ধ্বজা উঁচু বাঁশে উড়ছে। আপনার পাণ্ডাকে দূর থেকে ধ্বজা দেখে খুঁজে বের করুন, পাণ্ডাদের সকলেরই জলের ধারে তক্তা পাতা প্লাটফরম তৈরী আছে। কষ্ট হবে না। কল্প-বাসের জন্য পশ্চিমবাসিনী বাঙ্গালী বিধবা গিন্নীরা বিস্তর চট ও কম্বল নিয়ে যান। কুটিরের ছপ্পরের ওপর তাই গরম রাখবার জন্য পাতা হয়। জব্বলপুর থেকে এক বাঙ্গালী গিন্নী বেণীঘাট দেখে বললেন, "পৈরাগে বৈরাগ আসে!" কলকাতার গিন্নীদের সে শীত সহ্য হয় না। মেলা মাঘ মাস ভোর চলবে। মাঝে মাঝে "নেহান"কা এক একটা ভিড় হবে।

খেলনার দোকান চারিদিকে। পুতলোনাচ-ওয়ালা হাতে ননদ-ভাজের ঝগড়া দেখাচ্ছে, "সীতাবো গুলাবো কি তামাশে!" পূজার জিনিসের দোকান, সিনেমা, ম্যাজিক, বালির ওপর। মেলা কমিটির আফিস গম গম করছে। ছোট ছোট হোটেল (নিরামিষ)। দুধের দোকান, হাসপাতাল, পুলিস "নাকা" চারিদিকে। "নাকা" মানে থানা। ইলেকট্রিক আলো, পোষ্ট-আফিস ও বুকিং আফিস হয়েছে।

মানুষ হারানো আফিস ও পুলিসে এবং ভলাণ্টিয়ারে গিসগিস করছে। কুড়িয়ে পাওয়া গহনার খাতাও আছে। বাঙ্গালীর বউ গহনা হারাতে মজবুত। এক বাঙ্গালী পত্নীর সঙ্গে 'হরি' বলে ছোট ৬ বছরের ছেলে নিয়ে মেলা দেখছেন। তিনি স্ত্রীকে আদর করে 'হরের মা' বলে ডাকতেন। একদিন হঠাৎ তাঁর স্ত্রী হারিয়ে গেল। তিনি সমস্ত বালির চড়ার ভিড় ভেঙ্গে তিন দিন "হরের মা! হরের মা!" বলে চিৎকার করছেন। এই থেকেই বোধ হয় কথা হয়েছে "কাঁহাতক হরের মা হরের মা করে বেড়াব?"

চলুন এখন কচৌরি জেলেবি খেতে। মহাসমারোহে তীর্থস্থানের দোকান বা হোটেল সকলকে খাওয়াচ্ছে। সাম্‌নেই গরম গরম ভাজছে, পেছুতে সারি সারি বেঞ্চ পাতা, টেবিল নেই। অগ্নিপাবক। যা খাবেন কিনে নিয়ে ব্যাক-বেঞ্চে পবিত্র জার্ম-ফ্রি আগুনের মত গরম জেলেবি, জেলেবা, "জেলেবি-কি-বাপ জেলেবো" (৩ রকম) খান।

তরকারি?—আলু, কুমড়া, কচু, লঙ্কা দিয়ে রাঁধা এমন তরকারি কলকাতার কোন হালুয়াই করতে পারে না। কচৌরি যেমন গরম তেমনি মুচমুচে। "দেখ্‌নে সে জান লুলুয়াত হ্যায়" আমরা এই তিন জিনিস মাত্র খেতাম। কলেরার ভয়ে ঠাণ্ডা অন্য ৬ রকম তরকারি,

রায়তা, কালাকন্দ, বরফি, লুচুই, তিন-কোনিয়া (শিঙ্গাড়া), ঘেওড়া, পেড়া, গুলাবজাম, বুঁদিয়া, রসগোল্লা, খজুর, সাগুলা কি লাড্ডু, মতিচুর ছুঁতাম না।"

বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও বাঙ্গালী মহিলাগণ একসঙ্গে বসেই খাচ্ছেন, চান করার পর এতটা পথ বালি ভেঙ্গে এসে ক্ষিদেয় সকলেই গোগ্রাসে গিলছেন। কচৌরিতে হিং ও কলাইয়ের ডালের পুর থাকে, পুর থাকলেই পশ্চিমা মুসলমানরা 'পুরী' বলেন। 'দালপুরী' বাঙ্গালী বলে। সে দেশের হিন্দুরা লুচিকে পুরী বলে।

একদল খাঁটি সাহেব মেম টেলিসকোপ দিয়ে একলাখ নিরঞ্জনী আখড়ার সাধুদের সঙ্গমে স্নান দেখছেন। সাহেবেরা এখন কচৌরি ও লাড্ডু চিবুচ্ছেন, এক কোণে দাঁড়িয়ে। দুই হাতেই খাচ্ছেন। 'জল ট্যাপে' হাত লাগিয়ে খেতে হবে; সাহেবেরা ছুঁতে পারবে না, তাই একটা খালি দইএর প্রকাণ্ড মালসা করে জল সাহেবদের দেওয়া হয়েছে। বাঁদরের মতন উবু হয়ে মুখ ডুবিয়ে তাঁরা জলপান করছেন। যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে খোকাখুকিরা। কলকাতায় সে 'জেলেবি' জোটেনা। সে কচৌরির অভাবে তার স্মৃতি মনে জাগছে, তাতেই আরাম,—হিন্দীতে বলে "ঘি না খাই তো কুপ্‌পি বাজাই"। ঘি ফুরিয়ে গেলে ঘিয়ের খালি চামড়ার কুপোটা তবলার মতন বাজাই। সমান আনন্দ।

পশ্চিমপ্রদেশীয়া অনেক রমণী তীর্থস্থান বলে পরদা পরিত্যাগ করে 'কচৌরি' চিবোন ও বাঙ্গালী বউ-ঝিদের সঙ্গে কথা বলেন।

অনেক ঝগড়াও কচৌরি খেতে খেতে হয়। বাঙ্গালীবাবু খোট্টাকে বললেন, 'আপ হামরা বউকে কেন দেখতা হ্যায়, মুখের পানে হাঁ করে তাকাতা হ্যায়?' খোট্টা উত্তর দেন, "অন্দর কিয়া বাবু! মেয়ে আওরত

আপকো আওরতসে বহুত গোরী হেই, মালুম হোতা য্যায়সা রংমহলসে নিকলি হেই। ময় কেঁও আপকো কারি জরুকো লালচি আঁখ সে দেখুঙ্গা ? মেরা আওরতকে তরফ আপ তো পহলেই ঝাঁকি ঝাকা মারা। তব ময়নে থোঁড়িসি জরিমানা উস্থল কিয়া।" 'কারি' মানে কালো।

বেণীঘাটের কচৌরির কাছে শহরের বাজারের কচৌরি হার মানে। একটি বাঙ্গালী মহিলা খেয়ে তাঁর স্বামীকে কানপুরে চিঠি লিখলেন, "ওগো যেন ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট, সরুচাকলীর সঙ্গে মিশে মোলায়েম খাস্তা বানিয়েছে। ঘ্রাণে কত হারানো কথা প্রাণ যেন আবার কুড়িয়ে পায়।"

তাই বেণীঘাটের একশ টাকার কচৌরি ও জিলেবি এলাহাবাদ প্লাটফরমে লুট হয়েছিল। রেওয়ার রাজার স্পেসল 'জব' প্ল্যাটফরমের নিকট দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর ১০০ সেপাই গঙ্গা চান করে বেণীঘাট থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি গরম কচুরি জিলিপি এনে বটপাতের থালে সাজিয়ে সারি সারি ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য উবু হয়ে বসেছে। সে দেশে শালপাতা নেই। ব্রাহ্মণ ভোজনের উপযুক্ত স্থান চওড়া প্ল্যাটফরম।

রেলওয়ের ঝাড়ু হাতে মেথরদের তাই দেখে লোভ

বায়সে বঞ্চিয়া নিজে করিতে ভক্ষণ। প্রথম গ্রাস মুখে ওঠবার আগেই এক দাঁড়ানো মালগাড়ীর হুইস্‌ল্ বাজল 'পী-ই-ই-ই।' এক ধূর্ত মেথর চীৎকার করল, 'আব ইসপিসিল ছুটেগা, সিটি মারিস!' গাঁওয়াঁইয়া সেপাইরা কচুরির ভোজ ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে লাইন পার হয়ে সাইডিংএ সেই স্পেসল ট্রেনে চড়ল। শৃগাল-মেথররা খুব ভোজ খেলে ও গরীব বউ ঝিকে খাওয়ালে। এ রকম ধাপ্পা দেওয়াকে হিন্দীতে 'ঝাঁসি পট্টি' বলে। একে চুরি বলে না। পরিত্যক্ত খাবার যে সে লুটতে পারে—মানুষ, শেয়াল।

প্রয়াগের কচৌরি এত বিখ্যাত যে, এক খোট্টা ভদ্রলোক নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন 'কচৌরি'। ছেলেকে ধমক দেবার সময় চেঁচাতেন, 'ইয়া মে উ-অ কচৌরি!' 'মে' মানে 'রে'!", 'আ বে উ-অ কচৌরি!' 'বে' মানেও তাই। 'রে' ভয়ানক গালাগাল। প্রয়াগে 'কচুরি' 'জিলিপি' বলে না।

কলকাতার খোট্টা হালুয়াইরা কচৌরি দুবার ভাজে। সাহেবী কটলেটের মত প্রথমবার 'হাফ ডন' ভেজে তুলে নেয়। প্রয়াগে একবারেই কড়াই থেকে তোলে। বলে, 'কচৌরি ক্যায়সা ডেহুরতি হ্যায়!' (কেমন ফুলছে!)

চলুন এবারে সাধু দর্শন করি। নিরঞ্জন আখড়া অনাবৃত সাধুদের বৃহৎ আড্ডা। পুলিস ঘিরে আছে। স্ত্রীলোকদের সেদিন যেতে বারণ। ছাই মাখা ধুলা মাখা প্রকাণ্ড একটা সাদা পাহাড়ের মতন লক্ষ সন্ন্যাসীর চ্যাঙড় জলে নাবল। শত শত বাইনকুলার নাকে বসল। যখন উঠে এল সাদা সন্ন্যাসীর 'আভালান্স' কালো হয়ে উঠল। ছাই ধুয়ে পাকা রং দেখা গেল। ফোর্ট থেকে সাহেব-মেম দূরবীন লাগিয়ে দেখতেন। এখন তাঁরা নেই। পুলিস রেগুলেশনে এক সঙ্গে স্নান হয়, ডিসিপ্লিন বজায় থাকে।

কেল্লায় গোরালোগ 'রেডি' থাকতো। তা ছাড়া যখন নিরঞ্জন আখড়া স্নানে যেত ও উঠে আসত দু পাশে মাউনটেড পুলিস থাকতো, এখনও থাকে। খোদ ম্যাজিস্ট্রেট ও এস পি হাজির।

সারি সারি সাধুরা কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে বেলা ২টোয় বসে আছে। দল বেঁধে দেখে বেড়ালাম। কথা বলতে দ্বিধা বোধ হয়। একজন সাধুর সৌম্যমূর্তির কাছে উবু হয়ে বসলাম। বললাম, 'পাও লাগি

সাধু বাবা! কাঁহা বাবাকে ঘর থা?' তিনি বললেন, 'মৈমনসিং'। 'অ্যা! আপান বাঙ্গালী? দয়া করে বলুন প্রভু কি দুঃখে সংসার ত্যাগ করেছেন।' তিনি উত্তর দিলেন না, আমার এটিকেট বিরুদ্ধ কাজ হয়েছে।

ফের এটিকেট ভেঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কি স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হয়েছিল না রেসকোর্সে সব হেরেছেন?' উত্তর নেই। উঠলাম, —খানিক দূরে গিয়ে দেখি একটা দশ বছরের বালক সাধুবেশে চিমটে হাতে আসছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'পাঁও লাগি পাহাড়ী বাবা! আপ কেঁও এতনা কম উমের মে ফকিরী লিয়া?'

আমার মাথায় চিমটে ঠেকিয়ে বালক সাধু উত্তর দিল, 'সন্সার মে বৈরাগ আ গিয়া!' আমার সাথী উকীল বেণী ঘোষ বলেন 'আ মর্ ছোঁড়া কবেই বা তোর সংসার হলো, কি করেই বা কাঁচা বয়সে বৈরাগ ধরলো। তোম কিসি লেড়কীকে ভালবাসা থা?'

ছোঁড়া বললে 'আঁয়?' বুঝতে পারলে না। দলের লোক যখন হেসে উঠল তখন বেণীবাবু বললেন, 'বালকের প্রেম আশ্চর্য নহে। নেপোলিয়ন আট বছর বয়সে ৬ বছরের গিয়াকোমিনেটাকে ভাল-বেসেছিল।'

গঞ্জিকার উগ্র গন্ধ চারিদিকে ভুরভুর করছে। লম্বা লম্বা ফাটা পরিত্যক্ত ছিলিম চারিদিকে পড়ে আছে। হিন্দুস্থানী চাকর বললে, 'যব গাঁজড়চি সাধু বড়ি জোরসে ছিলিম পিতা হায় তব ফট্‌সে ছিলিম ফাট যা'ত হায়।' 'গাঁজড়চি' মানে গাঁজাখোর।

তিন কম্পার্টমেণ্টের 'মাঝাউলী' গরুর গাড়ী চড়েন লখনউ-এর খুব বড় সন্ন্যাসীরা। ১২৫ মাইল এই গাড়ীতে এলাহাবাদ যায়।

তিন সাধু ও এক গাড়োয়ান। সাদা ধপ ধপ তিনটি মন্দির। চুনকাম করা কাপড়ের। রাজারা অনেক টাকা দেন, তালুকদার ও জমি-কাড়া জমিদার।

পত্নীর সঙ্গে ঝগড়া করে অনেকে সন্ন্যাসী হয়, আবার অমুক মেয়েটা পত্নী হল না বলে অনেকে সন্ন্যাসী হয়। বিয়েটাই তা হলে হচ্ছে প্রধান কারণ, হলেও সন্ন্যাসী, না হলেও সন্ন্যাসী। ডেরা-ইস-মাইল-খাঁর জমিদার টহলরাম গঙ্গারাম ৭২ লক্ষ ভারতের অলস সাধুকে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা করে ১৯০৩ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর মতে দাম্পত্যকলহ প্রধান কারণ। আবার হিন্দী গানে সন্ন্যাসিনী বলছেন, 'হে রাজা, তুমরে লিয়ে লিয়া ফকিরী বেশ!' বিয়ে হল না বলেই তপস্বিনী। আস্পর্ধা কম নয়, গরিবের মেয়ে রাজাকে বিয়ে করবেন। যা ছুঁড়ি পৈরাগে বৈরাগীদের সঙ্গে ঘুরে মর্!

বাঁদর কাঁধে সাধু, ভাল্লুকের বাচ্চা কোলে সাধু, পাইথন সাপ জড়ানো সাধু দেখলাম ঝুসিতে, গঙ্গার ওপারে। সাপটা হরদম কমফরটারের মত জড়ানো। আর এক 'টানাপাখা' সাধু দেখেছি। ইনি দুই ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে কাকাতুয়ার মতন উঁচু আম গাছ থেকে ঝোলেন, মুণ্ড নীচু করে শাঁখ বাজান। নীচে গনগনে আগুন জ্বলছে। এক চেলা তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে দূরে বসে টানাপাখার মতন দোল খাওয়াচ্ছে আর বলছে, 'সাধু বাজাওয়ে শঙ্খ!'

মুণ্ড নীচু করেই পায়েস ও লুচি খান, একজন খাইয়ে দেয়। বুদ্ধিতে কি এর ব্যাখ্যা চলে?

ভেবে চিন্তে লোকে সন্ন্যাসী হয়, না কি লোকে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়? সামান্য বচসাও কি (আত্মহত্যার মতন) সংসারত্যাগের

কারণ? এক ডেপুটির গিন্নী স্বামীকে বলছেন, 'আর শুনেছ? পাশের বাড়ীর ডেপুটি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছাড়বেন, ১৫ দিন ধরে আয়োজন হচ্ছে, গেরুয়া কাপড় ছোবানো হচ্ছে, প্রয়াগে মাঘ মেলায় জয়েন করবেন।'

স্বামী বললেন, 'ক্ষেপেছ? ১৫ দিন ধরে বুঝি সন্ন্যাসী হবার আয়োজন হয়? এক মিনিটে লোকে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়!'

স্ত্রী হেসে বলেন, 'শোন কথা! এক মিনিটে বুঝি কেউ সন্ন্যাসী হয়! কি বুদ্ধি!'

স্বামী বলেন, 'তবে দেখবে!' বলে ইংরাজি পোশাক খুলে একটা গেরুয়া রঙের পরদা ছিল সেটা তাঁর বুকের উপর বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন, বরফ বাঁধা কুটকুটে কম্বলটা বাঁধে ফেললেন, রান্নাঘরের পিতলের লোটাটা হাতে নিলেন, আর বড় চিমটেটা। 'বোম্ বোম্' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

দুইঘণ্টা চারঘণ্টা গেল ফিরলেন না। পরিহাস কি এতক্ষণ থাকে? আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব খবর পেলেন। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। ৭ দিন গেল, এলেন না। স্ত্রী ধরাশায়ী হলেন।

আহার নিদ্রা ত্যাগ করে স্ত্রী ভাবেন, প্রভু, স্বামীকে ফিরে দাও, আর কখনও তাঁর সঙ্গে তর্ক করবো না। ৩ মাস কেটে গেল, স্ত্রী কঙ্কাল হয়েছেন, অনুতাপ তীব্র কশাঘাত করছে। অভাগিনী একদিন অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রয়াগে মাঘ মেলায় বোম্বাই, সিংহল, মাদ্রাজ থেকেও সাধুরা আসেন। ১৯১০ সালে একটা আমেরিকান সাধু এসেছিল। সে কালা সাধুর সঙ্গে বসে নি। আলাদা গাছের তলায় বসতো ও গাঁজা

খেতো। সংসার ছেড়েও তার দর্প ঘোচে নি। আলখাল্লা পরতো।

কত বড় রাজ্য 'ত্রিবেণীর পানি' ডাঙ্গায় বিস্তার করেছে যে লক্ষ লক্ষ লোকের স্থান হয়? উত্তর পাবেন চার লাইন হিন্দী গানে।

ভরদ্বাজঘাট বেণীঘাট থেকে তিন মাইল উপরে। এই ঋষি এখানে রামচন্দ্রকে একটি নাদুসনুদুস ষাঁড় দান করেছিলেন।

আর খুরদাবাদ হচ্ছে বেণীঘাট থেকে আট মাইল নীচে, এইখানে শহর ভেদ করে ত্রিবেণীর চিহ্ন বা নিশানা শেষ হয়েছে। ত্রিবেণীর জল এলাহাবাদ ফোর্ট (কিলা বা কেল্লাকে) গ্রাস করেছে :—

ভরদ্বাজঘাট সে গিয়া
খুরদাবাদ নিশানী,
আকবর বেটা কিলা বনায়া
ত্রিবেণী কে পানি।

তার পর ?

"তার পর ?" মামী জিজ্ঞাসা করলেন। ভাগনে উপেন্দ্র প্রদীপের শলতে উস্‌কে দিয়ে "তটিনী তরঙ্গ" উপন্যাসের খোলা পাতায় আবার চোখ বুলুতে লাগল। বলতে লাগল ব্যাখ্যা করে—

"হ্যাঁ, তার পর তটিনী একটু রাগ দেখিয়ে ও ঘরে চলে গেল, যাবার সময় তর্পণকে বলে গেল, সকলের সামনে তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক কেন ? তখন ঘরে—শুনছো মামী,—মাসীমা শুনছ তো ?—আর কেউ ছিলনা। তর্পণ পাশের বাড়ির ছেলে, বয়সা ধরেছে, গলা থেকে যৌবনের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ও বালকের কোমল কণ্ঠ এক সঙ্গে বেরিয়ে তাকে মুশকিলে ফেলেছে। গোঁফও গজিয়েছে, তটিনীকে দেখলে তার তামাম শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বুক স্পন্দিত হয়। তার বাহুতে দানা দানা "পদ্ম কাঁটা" হারপিস রোগ ছিল, সে মনে করতো তটিনীকে দেখে বুঝি এগুলোও হয়েছে। ঘামাচি বেরুলে ভাবতো, "তটিনী আমাকে নাজেহাল করছে। গা মন্ন কাঁটা !"

এ-বাড়ির ও-বাড়ির ঝি, রাঁধুনিও গল্প শুনছিল, গ্রাম সম্পর্কে এক মাসীমাও ছিলেন ; সে কালে নিরক্ষরার দল প্রেমের গল্প শুনতো এই রকম করে।

মাসী জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ বাবা উপিন, সে মেয়েটার বয়স কত ছিল ? সে তর্পণকে ভালবাসতো তো ? সোমত্ত, তবু বিয়ে হয় নি ?"

"মাসী, সে পাতে এখনও পৌঁছি নি, বয়স পরে জানতে পারবো";

উপেন্দ্র বললেন। এই নভেল পাঠ মিথিলার এক বিখ্যাত শহরে হত। ন-দশ বয়সেই "সোমত্ত" সে কালে।

রাঁধুনী বামনী প্রশ্ন করলো, "হ্যাঁ গা ছোট বাবু, যে এই গপ্প নিকেছে সে গেরস্ত বাড়ি ঢুকে এ সব কাণ্ড কারখানা দেখেছে? তটিনী গেরস্তর কাজ কম্মও করছে, না কেবল ভালবাসা আর ভালবাসা, হেঁসেল ঠেলতো কে? বাসন মাজার কথা নেই। খাওয়া দাওয়া কেউ করছে না, খালি সাজ গোজ আর, এ রাম! —কি কেলেংকারি! ঢুকে দেখে নিকেচে কি? গেরস্ত বাড়িতে তো এমনটি ঘটে না,—মেয়ে ঘরকন্নাই করে।"

'পাশের বাড়ির এক রাঁধুনিও ছিল, সে বলল, "কেন ঘটবে না দিদি? গেরস্ত বাড়ি যত ঢলাঢলি হয় এত—"

মাসীমা গেবস্ত বাড়ির দিক টেনে বললেন, "মুখ সামলে কথা বল্, তুই-ই দেখছি ঢলালি!—গেল-যা!"

নবীন বলল, "তার পর?" এই ছেলেটা আগের রাত্রে তটিনীর বয়স জিজ্ঞাসা করছিল বলে তার মায়ের হাতের একটি থাবড়া খেয়েছিল। মা বলেছিলেন, "তোর সে খোজে কাজ কি হতভাগা ছেলে, ইস্কুলের পড়া গোল্লায় গেল, এখন যুবক যুবতীর দিকে টান!"

পাশের বাড়ির ঘোষগিন্নী একটু বুড়ী। কখনও বর্ণপরিচয় প্রথম দেখেন নি। তার উপর একটু ন্যাকা। জিজ্ঞাসা করলেন, "বউ মা! যুবতী বলে না ঐ যারা ডাকাতি করে? আমাদের গাঁয়ে একবার যুবক যুবতীর উৎপাত হয়েছিল—"

প্রসন্ন বামনী হেসে বলল, "শোনো কতা! যুবতী একরকম গয়লা জাতে, তারা ছেলে পিলেদের মাথা খেয়ে দেয়।"

গম্ভীর কালী ঝি বললে, "আমি একবার আমাদের দেশে গাছের তলায় একটা যুবতী দেখেছিনু, পেতনীর আর একটা নাম আর কি! —তার পর?"

এ ধারণা কিছুই আশ্চর্য নয়। বাদুড় বাগানের এক পুরোহিত আমাকে মন্ত্র পড়াবার সময় "ধুপদীপৌ" উচ্চারণ করতে পারতেন না, বলতেন "যুবতীঔ"।

"তার পর?" একটি ষোল বছরের মেয়ে জিজ্ঞাসা করলো। এ মেয়েটিরও 'ক' অক্ষর গোমাংস, গুশকরা থেকে এসেছে, সেও হাবা কম নয়। "তাব পর?—আচ্ছা, একটা কতা সুদুই বড় দাদা, আমাদের দেশের ডাকাতকে "যামিনী" বলে আর গেরস্তরা বাড়ীর লোকজনকে "যুবক যুবতী" বলে, জানেন তো? ডাকাত পড়তে যায় যখন তখন লোকে গান গেয়ে সাবধান করে:—

যুবক যুবতী জাগো
যামিনী যে যায় রে!"

রাত্রি ৯টার সময় খাওয়া দাওয়ার পর নভেল ব্যাখ্যা শুরু হতো, ঘরে প্রায় পঁচিশ জন বসে শুনতো, অনেকটা কথকতার ভাবভঙ্গী থাকতো, কেবল গান হ'ত না। স্রেফ গড় গড় করে পড়ে গেলে মূর্খ স্ত্রীলোকেরা বুঝতো না। এই নভেল পাঠ ফ্যাশন ৭৫।৮০ বছর পূর্বে অনেক বাড়ীতে ছিল। রামায়ণ মহাভারতও বিস্তর পড়া হ'ত। কিন্তু মজা বোধ হতো নভেলে।

যত থার্ড কেলাসের নভেল—

"শরৎ-সরোজিনী" (॥০) "উপেন-উষাঙ্গিনী" (।৵০) "বিনোদ-বিনোদবালা" (।০)। ব্যাখ্যা ও পাঠরীতি ছিল এবং "বেঙের-ছাতা"

(mushroom) ঔপন্যাসিকরা এক এডিশনেই অর্ধচন্দ্র পেতেন। উঁচু ধরণের উপন্যাসও পড়া হ'ত,—"চন্দ্র রোহিণী, বিষবৃক্ষ, হরিদাসের গুপ্তকথা, কাদম্বরী।"

যিনি ব্যাখ্যা করতেন তাঁর অনেক ধৈর্য ধারণ করতে হ'ত, ক্রোধ সংবরণও আবশ্যক হ'ত। বাড়ির আধ বুড়ি বিধবা আইমাকে ভয়ও খেতে হতো। 'কিন্তু সধবা মাসীমা তাঁর দলে ব'লে নভেল ব্যাখ্যা ত্রিকরূম অগ্রসর হতো। বাড়ির কর্তা বড় অফিসার। তিনি প্রেমের ধার ধারতেন না, অন্য ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতেন। থিয়েটার সিনেমা ছিল না, সন্ধ্যার পর এতেই মেয়ে পুরুষ আনন্দ পেত।

"তার পর?" একজন বলল। উপেন বলল, "তার পর তটিনী একদিন সেজে গুজে কাঁচ পোকার টিপ পরে তর্পণের মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে—"

"ওমা মেয়ের ঢং দেখ। বলি হ্যাঁ গো ছোটবাবু! সেই মেয়েটা সেয়ানা? বয়সটা দেখে বলে দাওনা।" একটি বিধবা জিজ্ঞাসা করল।

"এ কি?" উপেন বয়স দেওয়া পাতাটা খুলে চিৎকার করল! "ছুলে দিল কে রে?" সধবা গিন্নী মাসীমা (কর্তার স্ত্রী) হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বললেন, "বয়স দেখবার জন্য নবীন কাল পাতা উল্টেছিল, খুঁজে পায় নি, আমি তা ছুলে দিয়েছি।" নবীন তাঁর বড় ছেলে, বয়স মাত্র বারো, "পিঁপুল পেকে আসছে" লোকে বলতো। অর্থাৎ নায়িকার খুঁটিনাটি জানতে ব্যগ্র।

বামুন দিদি বললেন, "ঠিক করেছ বউ মা! আমি ঐ জন্যে আমার হরিকে ল্যাকাপড়া শেখাই নি, ছিরামপুরের ইসকুলে পড়তে চেয়েছিল।

ন্যাকাপড়া শিখলেই—কেতাবে ঐ যে তাদিকে কি বলে—হ্যাঁ, যুবক যুবতীর মাখামাখি পড়বে, ন্যাকাপড়াতেই দেশ ডুবলো।"

"তার পর?" কেউ কেউ অবান্তরে বিরক্ত হয়ে বলল। উপেন ব্যাখ্যা আবার উৎসাহের সঙ্গে শুরু করল—"তটিনী চিঠি লিখেছে। তর্পণ লুকিয়ে পড়ছে! ভাই তপু!—"

"ঘেন্নায় মরি মা! ঘেন্নায় মরি!" বিধবারা চেঁচিয়ে উঠলো, "ভাই কি লো বেহায়া ছুঁড়ী! তোর কত বয়স কে জানে, ধেড়ে হলি এখনও —বঁটিতে তরকারিও একদিন কুটলি না।"

উপেন বললে, "এখনও বিয়ে হয় নি কিনা তাই ভাই—"

বাধা পড়লো। মোটা সুন্দর আইমা, কুইন ভিক্টোরিয়ার মতন বপুখানি, ঝংকার দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "এত রাত্তির পর্যন্ত কি পড়ছিস?"

সকলেই হতভম্ব, ভয়েই অস্থির। উপেন আমতা-আমতা করে বলল, "আইমা, এই গল্পটা শোনাচ্ছি, তর্পণের সঙ্গে তটিনীর—"

"সে তো আমি পরশু খানিকটা শুনে গেছি। সে ছুঁড়ির হলো কি? বিয়ে এখনও হয় নি?"

"না আইমা হয় নি!"

"বিয়ে শেষে হল তো?"

"আইমা! এখন বললে সকলে বলবে রসভঙ্গ হয়ে গেল!"

"তা বলে তুই রাত বারোটা পর্যন্ত একটা হেস্তনেস্ত করে উঠতে পারলি না,—তটিনী এ বলেছে, তর্পণ তা বলেছে, আর এত ঘুজুর ঘুজুর দরকার কি, বল্ আমাকে সাফ কতা, ছোঁড়া ছুঁড়ী দুটোর শেষকালে বিয়ে হল কি না? বল্ এক কথায়, হাঁ কি না?" উপেন্দ্র

ঘেবড়ে গিয়ে ঘাড় নিচু করে বলে ফেলল, "হ্যাঁ আইমা বিয়ে শেষে হ'ল।"

"তাই বল্ কায়েতের ঘরের মুখখু! এত দিন লুকিয়ে রেখেছিস কেন, এতগুলো লোককে রাত্তিরে হয়রান করছিস! বিয়ে হল বলে দে, সুখে ঘরকন্না করতে লাগল বস্, আমরা কি কখনও বিয়ে থাওয়া করি নি? এক কথায় আমাদের এক গা গয়না পাছাপেড়ে রাঙ্গা শাড়ী পরে বিয়ে হয়ে গেল, ১০ মন তেলও পুড়লো না রাধাও নাচলো না। বিয়ে হল খোলসা বললেই তো এক কথায় ঝঞ্ঝাট মিটে যেত। যা, রাত হয়েছে, সব শুয়ে পড়, কাল আবার কলাই লেন্ডর হাঙ্গামা আছে।"

৩৬৯১

কালো জাম

ল্যাংড়া পাকার সঙ্গে সঙ্গে জামের হৃদয়বীণা বেজে ওঠে। কাঁঠাল সুন্দরীও আমাদের মতন গরিবের সংসারযাত্রা সুখময় করবেন বলে নিস্পন্দ কিন্তু রোমাঞ্চিত শরীরে মানিকতলা বাজারে কাত হয়ে শুয়ে দল বেঁধে সৌরভ বিতরণ করছেন। থাক্ শুয়ে, আজ জামের কথাই বলি।

জামকে "কালো জাম" বলে কলকাতায়, এতে আমার বিরক্তি লাগে। পোড়া রং-এর পানতুয়াকে "কালো জাম" বলে, ফলটাকে শুধু 'জাম' বলে, বিহারে বলবেন "জামুন" আর ইউ. পি-তে বলবেন "ফরেঁাদে"।

বিহারে "জাম" বললে বড় কাঁসার "জামবাটি" বোঝায়। হিন্দুস্থানীরা কলকাতায় "জাম" বললে "ট্রাফিক ব্লক"ও বোঝে।

"কালে কালে ফরেঁাদে!" হেঁকে লখনউ-এ জাম বিক্রী করে বটে, কিন্তু এ 'কালো' মার্জনীয়, কারণ কোনও পানতুয়াকে সেখানে 'কালো' বলে না। ক্ষীরের একরকম চমৎকার পানতুয়া হয় তাকে বলে "গুলাব জামুন"।

জাম কত সুখস্বপ্নতুল্য ফল এ থেকে বুঝুন। 'ব্যঙ্গ রঞ্জিত হয়ে ক্ষীরের খাবার হল জামের উপমেয়। অথচ জামে মজঃফরপুর rose-scented লিচুর মতন, বা বাংলাদেশের গোলাপজামের মতন গোলাপ গন্ধ আদৌ নেই।

আম-লিচুর তুলনায় জামের বাগানকে জঙ্গল বললেই হয়। জামুই, জামতাড়া, মিহিজাম কর্ড লাইনে এক সময় জামের বন ছিল। [illegible]

খেতে গিয়ে জামুইএর জঙ্গলে অনেকে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাস্তায় বর্ধমানের কাছে জামের বন আছে। দু পাশেই জাম বাগান, তার ভেতর ডাকাত লুকিয়ে থাকে ও যতদিন জাম থাকে সেই তাদের খাদ্য, সেইখানেই বাসস্থান। এখানে বাঘ নেই। আমার এক হিন্দুস্থানী চাকর বর্ধমান স্টেশনে নেমে চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটে বামুনপাড়া যাচ্ছিল। তিন জন খোট্টা তাকে বলেছিল, "এই জাম পকইছে।" চাকরটা বলল, "জাম পকইছে তা হামার কি?"

"জাম খাবি না শালা?" বলে তারা ঠ্যাং দুটো ধরে রঙ্গুয়াকে হিঁচড়ে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গেল ও সাত টাকা ট্যাঁক থেকে কেড়ে নিল।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক ডাকাতরা সব হিন্দুস্থানী, কিন্তু বাংলা বলে। বর্ধমানের জাম ঝুড়ি ঝুড়ি কলকাতায় একসময় চালান আসত, ভাল জাতের ফল, টক, মিষ্টি, খুব কষা। এই "কষায়" বড় উপকারী। কবিরাজী মতেও, বিলাতী চিকিৎসা মতেও। অনেকে বাড়ীতে জামের সিরকা তৈরী করেন। আমি রোজ ২৫টা সিগারেট খেতাম। যখন দেখলাম হাঁফ ধরে, চলতে পারি না, হাত পা কাঁপে, তখন এক দিনে সিগারেট ছাড়লাম। তিন দিন খুব কষ্ট হল। কিন্তু বুনো কষা জাম মুখে রাখতাম, তাতে জিবে বেশ একটু 'সিগারেট সেন্‌সেশন' বোধ হত ও মনটা ঠাণ্ডা থাকত। যাঁরা সিগারেট ছাড়তে চান তাঁরা যেন জাম পাকলেই ছাড়েন।

বুড়ো জামের এত গুণ জানতাম না। "এই বেটি! দেখি একটা জাম দে তো, দেখি চেখে, কত করে কুড়ি?" বাজারে বললাম।

চেখে থুৎকার করে বললাম, "রাম! রাম! বুনো জাম!" বেটি

দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিলে, "জাম বনে ফলে না তো কি তোমার বিছানায় মশারির মধ্যে থোলো থোলো ফলে থাকবে?"

কবে ৭০ বছর পূর্বে মুঙ্গের জেলার জাম খেয়েছিলাম, এখনও মুখে লেগে আছে। সে এত কষা নয়। বাংলা দেশে চারি দিকে জাম গাছ। যত ওঁচা মরখুণ্ডেমারা জাম এ পাড়ার বাজারে বিক্রি হয়। আর বড বড সেরা জাম হগসাহেবের বাজারে যায়। সেগুলো ভাল হলেও মুঙ্গেরের মতন নয়।

পশ্চিমের এই জাম রঙে এবং রূপে বড জাতের ভোমরার মতন। বিহারে যে জানে বারান্দায় আলো জাললে "বোঁ বোঁ z-z-z... ঠক্" করে গুবরে পোকা ও ভোমরার দল আছাড় খেয়ে মেজের উপর মূর্ছা যায়। হাতে করে তুলে নিন, বুঝবেন, একই বিধাতা জাম ও ভোমরা তৈরী করেছেন।

জামের মহারানী অধিরানী বাস করেন লখনউ-এর বাদশাবাগ উপবনে, গোমতীর তীরে। বিহারের জাম এঁর পরিচারিকা বাঁদীমাত্র। বৃক্ষশ্রেণী চলেইছে, কোথা শেষ কোথা আরম্ভ কে জানে। আগডালে লোকরা বসে একটি একটি সুকুমারী কামিনীকে ছিঁড়ে দড়ি বাঁধা ঝুড়িতে সাবধানে রাখছে। ঝুড়ি ভরলে দড়ি ধরে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে ছোটী শাহাজাদীকী দেউড়িতে চালান হবে,—নিলাম হবে।

গাছের উপর একদিন উঠে দেখি, অর্ধ লুক্কায়িত নরম কৃষ্ণাঙ্গ জামগুচ্ছ!—রানাঘাটের পানতুয়ার মতন (না গোল, না লম্বা),—যেন ছিন্নপক্ষ ভ্রমরীদল শাপভ্রষ্ট হয়ে পাতার মধ্যে ঝুলছে।

এতে জিব আড়ষ্ট হয় না। ১০টা খেলেই বাঙালীর পেট ভরে।

বোঁটা ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে রেখে দিন। ভাত খাবার পর খান। গিন্নীরা আয়না ধরে জিব দেখেন যেন triple dye ঔষধ লাগানো হয়েছে। "চুরনকে মাফিক! তিন মিনট মে ভুখ লাগতি হ্যায়"।—ফের খেতে ইচ্ছে তখনই হবে। গিন্নী বলেন, "দেখ্ তো আমার জিবের রং!" কর্তা উত্তর দেন, "তোমার জিবের রং দরকার নেই,—একটা লাগাম আবশ্যক!"

—কোনও কবি এ হেন জামের উপর কবিতা লেখেন নি,—নারীর প্রেমেই অস্থির। এক স্থানে সামান্য বলেছেন কবি—"কোথা জম্বু রসাল মুকুল?"

বাজারে ভাঙা ঝুড়িতে জামসুদ্ধ মঞ্জরী দেখলে আমাদের "পল্লী জীবনের স্বপন মাধুরী" জেগে ওঠে। একটি যুবক জামের মতন কালো একটি মেয়েকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে "না বুঝে" বেজায় ভালবেসে ফেলেছিল। তার মা ভাবী পুত্রবধূর জন্য গুঁড়ো কয়লা মাখানো মুড়ো ঝাঁটা তৈরী রেখেছিল। বলেছিল, যেমন ছুঁড়ীর রং, তেমনি ঝাঁটার রং। ছেলেটা সাপে ছুঁচো গেলা গোছ হয়ে পড়লো, বিয়েও করতে পারছে না, ভুলতেও পারছে না। ক্যাথারটিক কবিতা লিখে কিছু প্রেমের অবসান হল:—

লো জম্বু-কালো সুন্দরী!
পান খেয়ে যবে ফিকি ফিকি
হাস; ভাবি তোমা দেখি
কে জাম দিল নখে চিরি।

লখনউ-এর বাদশাবাগের জাম ১৬ বা ১৮টাতে এক সের হয়; রানাঘাটের ফরমাশী পানতুয়া ১২টাতে এক সের হয়।

জামের ডালে লখনউ-এ ভদ্রলোকেরা "দাতুইন" (দাঁতন) করেন, জাম গাছের ছায়াকে ঔষধ ভাবেন, আর জামও খাদ্য এবং ঔষধ।

"ভুট্টা মেরা খানা-পিনা
লাঠি মেরা দোস্ত,
জামুন মেরা দবা-খানা
ল্যাংড়া মেরা গোস্ত।"

['গোস্ত' মানে যে-কোনও মাংস। "বড়া গোস্ত" বা চলিত কথায় "বড়া গোস" মানে বীফ]

"জাম (বা কাম) অভ টারটারী" শুনেছেন তো? 'জাম' রাজাধিরাজের উপাধি হয়ে মহৎ হয়েছে—"জাম অভ জামনগর"; স্থানেরও মাহাত্ম্য বাড়িয়েছে,—গঙ্গাম, জামসেদপুর, জম্মু, জাম-আলপুর।

আমরা কাকের দৌলতে এত জাম খেতে পাই। কাক আঁটি গেলে। মাঠে ঘাটে পৌষ্টিক নালী (alimentary canal) থেকে সেই আঁটি পরিত্যক্ত হয়ে গাছ হয়।

কাবুলে "বাগু গোসা" ফল। পিচ, বেদানা আঙ্গুর হয় বটে কিন্তু জাম কোন কাবুলী খেতে পায় না। প্রাচীন গল্প বলবো? (কি জানি কেউ লিখেছেন কি না):—এক বাঙালী একটি কাবুলীকে একটি প্রকাণ্ড লখনউ-এর জাম খেতে দিলেন, "খাঁ জী! খাইয়ে।" কাবুলীর বড় ভাল লাগলো।

একদিন এক গোবরের গাদাতে গোটাকতক ভোমরার মতন বড় গুবরে পোকা বসে আছে। কাবুলী মনে করল, এই তো জাম পেয়েছি!—দেখি একটা খেয়ে।

একটা কালো চুক্‌চুকে পোকা বড় দেখে বেছে নিয়ে সে যেমন হাঁ করে মুখে পুরতে গেল অমনি পোকাটা পালক মেলিয়ে বোঁ করে উড়ে পালাল। খাঁ জী অবাক হয়ে বল্‌লেন, "হুমনো! ডেড় হুমনো! বড়া শয়তান মেওয়া হ্যায়!"

হর্তুকী, আমলকী, জামের চেয়ে বেশী কষায়। "কষায়ট্‌ ফায়দে কি চিজ হ্যায়" পশ্চিমে বলে। এক বাঙালীর মাইনেতে কুলোত না। প্রতি বৎসর একটি করে সন্তান। জাম, আম, পাউরুটি, দুধ আনতেই নেই। সাতদিন হর্তুকী চিবোবার পর তাঁর স্ত্রীকে শাশুড়ি বলে ভ্রম হল। সরকারী নিয়ন্ত্রণের আদেশ, মারি স্টোপ্‌সের উপদেশ কিছুই আবশ্যক হল না। হাফপ্যাণ্ট, নেংটি, বিব, বেবিসুদার, অয়েল ক্লথ, কাঁথার খরচ বেঁচে গেল। সংসার সচ্ছল হল, আঁতুড়ঘর বৈঠকখানা হল। গিন্নীর শরীর মজবুদ হল।

ছোট খোকাটির বয়স দেখতে দেখতে ছ বছর হল। তাকে "ছোট দাদা" বলে ডাকতে কেউ জন্মাল না। খোট্টারা বলল, "ই সব হর-রে কি তামাশে!" (হর্তুকীর খেল)।

আশি বছর বয়সে এখন আক্কেল হয়েছে কেন মহাপুরুষরা পত্নীকে 'মা' সম্বোধন করে গেছেন। আমার লখনউ-এর বন্ধু বলেন, "উ মহাত্‌মা লোক জরুর বাংলা মুলুক কি হরোঁদে চেবাতে থেঁ; উস্‌কি অন্দাজট্‌ সে 'আপন আওরত কে শশুর কা আওরত সমজ তে থেঁ"।

১৩৬১

মিউটিনিতে গ্র্যাণ্ডট্রংক

মিউটিনিতে বিহার এবং ইউ. পি. ইংরেজের হাতছাড়া হলেও জগৎ বিখ্যাত গ্রাণ্ডট্রংক রোড ঈশ্বরের নিয়োগে সেপাইদের দৌরাত্ম্য থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল যে কটা সেপাই বাঙালীকে কাটবার জন্য গ্রাণ্ডট্রংক ধরে চলেছিল, তাদের বেশীর ভাগই 'ডেজারটার' বলে বোধ হত, সিপাই সুন্দরলাল ছাড়া পশ্চিমের এক ইংরেজী পত্রিকায় এই বিখ্যাত মিউটিনিয়ারের বাঙালী বিদ্বেষ ও অ্যাডভেনচারের কথা লিখেছিলাম; রাগের কারণ: 'বাঙালী সাহেব কা জুতা কি গুলাম হায়!' তাই বাঙালী পালিয়েছিল।

আমার দিদিমা জগন্মোহিনী দত্ত পুত্র কন্যা স্বামী মাতুলের সঙ্গে দানাপুর থেকে বর্ধমানে গরুর গাড়ীতে পালাচ্ছিলেন, প্রায় ২৬০ মাইল, এক মাসের পথ। তাঁরা বলেছিলেন, সিপাই সুন্দরলালকে গ্রাণ্ডট্রংকে কেউই দেখেনি; কেবল ভয় খেয়ে দিন কাটত। তার হাতে লোকে বললো কেবল তলোয়ার, বন্দুক ফেলে দিয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে টোটা নিয়ে বিবাদ হওয়াতে। তলোয়ারে বাঙালীকে দেখলেই কেটে ফেলত।

কিন্তু এত বোকা অন্য সিপাইরা ছিল না; তারা সেই মার্টান-হেনরি রাইফেল নিয়েই লড়েছিল। যেখানে সিপাই নেই শোনা যেত সেখানে আশ্রয় পেয়ে স্থানে স্থানে গ্রাণ্ডট্রংকে এত 'জাম' যে গরুর গাড়ী আটকে থাকত। বিপদ-সংকুল অংশগুলো অপেক্ষাকৃত নির্জন। রাস্তাতেই রাত কাটত।

গ্রাণ্ডট্রংক যাত্রীদের তেল ও বাতির লণ্ঠনে ঝকমক করছে। আবার শত সহস্র জোনাকি দু পাশের গাছের উপর দীপোৎসবে মেতেছে। দু পাশের উপবনের কি বাহার! সন্ধ্যা সকালে মে মাসেও কোকিলের গীত, দিনে সূর্যের কঠোর কটাক্ষ।

আমি এক কালে হেঁটে, পালকি, গাড়ি এবং একায় গ্রাণ্ডট্রংক বেড়িয়েছি। বর্ধমানের আপ-এ রাস্তার রং রাঙা, ডাইনে ই. আই. আর; বাঁয়ে সোনালী বালির অনন্ত বিস্তার; তার মাঝখানে ঘুমন্ত সাপের মত মে মাসের দামোদর।

'গ্রাণ্ডট্রংক ডাকগাড়ীর জন্য মিউটিনির আগে নিরাপদ ছিল; তখন সওয়ার মাঝে মাঝে পাহারা দিত। এখন তারা মিউটিনিয়ারদের দলে গেছে। রাস্তার পাশে ল্যাম্প পোস্ট কোন কালেই ছিল না। এলাহাবাদে খানিক দূর আছে।

আমার দিদিমা বললেন, 'আমরা একটা সরাইতে নেমেছি। মস্ত লম্বা বাড়ি, বারান্দার মাঝে মাঝে উনান আছে। মুদির দোকান পাশেই। খিচুড়ি চড়ানো হল। কুয়ায় কেমন জল দেখবার জন্য উঁকি মারলাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। কেবল ভীষণ পচা মড়ার গন্ধ নাকে লাগল! যত বাঙালী পলায়মান বিদেশী চাকর-বাকরদের সঙ্গে বলাবলি করছে এখানে নিশ্চয়ই কোন সিপাই আছে, তার এই খোট্টা সরাইবালার সঙ্গে ষড়যন্ত্র আছে; হয় তো সুন্দর-লাল খোদ বাঙালী কেটে কুয়ায় ফেলছে। বিস্তর অবাঙালীও দিল্লী কানপুর লখনউ থেকে পালাচ্ছিল। কেন, সে কথার এখানে স্থানাভাব।

'আমরা চটপট খেয়ে তল্পি-তল্পা বাঁধলাম এবং আবার বয়েল গাড়িতে চড়লাম। ভাবলাম রাত্রে সরাইয়ের চেয়ে ডাকাত তল্পা গ্রাণ্ডট্রাংক ভাল।'

পূর্বে যাঁরা কুম্ভ দেখেছিলেন এবং গ্রাণ্ডট্রাংকের মিউটিনির ভিড় দেখেছিলেন তাঁরা বলতেন, প্রাণ ভয়ে পলায়মান জনতার কাছে আর কোনও লোকারণ্য লাগে না। এটাকে সেই জন্য অনেক ঐতিহাসিক The Sepoy War বলে গেছেন। যাঁদের এই সকল রোমাঞ্চকর গ্রন্থ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে সকলেই বলে গেছেন এক-ই কথা ভিন্ন রকমে—It critically tested the valour and endurance of both parties.

গ্রাণ্ডট্রাংক স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বাদশাহী সড়ক; বিশেষ রকম চওড়া; তরঙ্গের মতন মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অনেকে কৌশল অভাবে অন্ধকারে ভূতলশায়ী হয়েছিল, অনেক স্ত্রীলোক রাস্তার ধারে সন্তান প্রসবও করেছিল, কেউ কেউ ঘোরতর রোগে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাল।

কোম্পানির Bullock Train যখন গ্রাণ্ডট্রাংক দিয়ে যেত সে এক দেখবার এবং লেখবার জিনিস। এক-শ বয়েল সামনে টানছে, পেছুদিকে আর এক-শ বয়েল জোতা আছে। সব কার্ট বা গাড়িতে লোহার চাকা, গাড়ি বাঁশের। দু পাশে বন্দুকধারী গার্ড; এক একটা গাড়ির উপর টাকার গাদায় বসে দু-চার জন ট্রেজারী ক্লার্ক।

গ্রাণ্ডট্রাংক ৭ মাস বৃষ্টি দেখেনি। ধুলো উড়ে রাস্তা দিনের বেলাও অন্ধকার। বুলক ট্রেন চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধুলো ধোঁয়ার মতন উড়ত।

এক একটা গাড়িতে ১৪ হাজার উইলিয়াম দি ফোর্থ টাকা লাদাই করা হত। এক লাখ টাকার ওজন ৩১ মন ১০ সের। লাখ টাকা লাদাই করতে ৭ খানা গরুর গাড়ি বা ৭টা হাতি লাগে। এর বেশি ভার চড়ানো বিজ্ঞানসম্মত নয়। গরুর ঘাড়ে, হাতির পিঠে নাকি বেঁধে।

গ্রাণ্ডট্রংকের ধারে কোথাও কোথাও ট্রেজারী ভল্ট থাকত, ডাকবাংলার কাছে সেখানে রাত্রিবাস করতে হলে ভল্টে গভর্ণমেণ্টের খাজনা থলে সুদ্ধ ফেলা হত। আমি পশ্চিমে ২০ লক্ষ টাকা ফেলবার শব্দ শুনেছি, হাজার টাকার থলে। কিন্তু কলকাতার 'মিন্টে' ৬ হাজার ছুটো টাকা মেশিনে উল্টে ভল্টে ফেলার ঝন্ ঝন্ শব্দ আরো মধুর, তাও শুনেছি।

১৮ লক্ষ টাকা ভল্টে রেখে একটি ট্রেজারী ক্লার্ক তার উপর সমস্ত রাত্রি খুব সুখে ঘুমিয়েছিলেন। সকালে উঠে বললেন, 'মারে গরম! মারে গরম! তামাম বদন সে গোল গোল র‍্যাশ নিকলা দেখিয়ে তো জনাব। সবমে ভিলিয়াম দি ফোর্থ কি তসবির হায় কিনা।'

এই সময় ফ্রান্স-এ Malle Post ছিল, অর্থাৎ চার ঘোড়ার ডাকগাড়ি। এখানে যেমন 'ডাক বাংলা' সেখানে তেমনি 'পোস্ট অফিস' বলত; তার বাহিরে প্রকাণ্ড আস্তাবল, ঘোড়া প্রাইভেট ভ্রমণের জন্য ভাড়া পাওয়া যেত এবং মেল কোচের রি লে-ও পাওয়া যেত। হোটেলে গ্রাণ্ড খানা পিনা হত। ডাকঘর, আস্তাবল, হোটেল, দোকান, আড্ডা দেবার স্থান একসঙ্গে মিশেছিল। মদের স্রোত বয়ে যেত।

'ইন' বা সরাইও ঘোড়া রাখত বিলাতে। ডাক ও মানুষ বয়ে নিয়ে যাবার গাড়ীকে মেল-কোচ, স্টেজ-কোচ, পোস্ট-শেজ বিলেতে বলত, এবং এ গাড়ী ও তার রাস্তা সাহিত্যে ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করেছে। গ্রাণ্ডট্রংকের ট্রাফিক কি এর চেয়ে হীন ছিল? না। শত শত উট হাতী চল্‌ত, উটের গাড়ী, সেডান চেয়ারও যেত।

রাজা মহারাজা জাঁক জমকের সঙ্গে বাজনা বাজিয়ে হাতী ঘোড়া পাল্কী নিয়ে যেতেন, এবং ঠিক ফ্রান্সের মত পোস্ট শেজ চলত! ১৮৮০ সালে এ রকম দুখানা কোচ এক রাজাধিরাজের আস্তাবলে পড়ে ছিল দেখেছিলাম। কালো গোল প্রকাণ্ড গাড়ী, চার কম্পার্টমেণ্ট। রেনলড্‌স বলেন যে এর প্রধান কম্পার্টমেণ্টটাকে 'কুপে' বলতো; অক্সফোর্ড বলেন 'কুপে' মানে এখনকার রেলগাড়ীর আধখানা (ছোট) কম্পার্টমেণ্ট। আর এক কম্পার্টমেণ্টের নাম ছিল 'ইনটিরিয়র'।

সেই রাজার ইংরেজ কোচম্যান আমাকে বলেছিল এ গাড়ী প্রত্যেকখানা ১০ হাজার টাকায় ইওরোপ থেকে আনা হয়েছিল। কে এনেছিল তার মনে নেই। 'But these were upon the Grand Trunk before the revolt'। চার ঘোড়ার উপর পোষ্টিলিঅন বা সওয়ার চড়ে যেত। ক্যামেল সওয়ার ছুটত; ধনী সওদাগর মাল বোঝাই উটে রাস্তায় 'জাম' তৈরী করতেন।

অনেক দূর থেকে গ্রাণ্ডট্রংকের যাত্রীরা, এবং দু' পাশের ভিলা-বাসীরা, বুঝত কোন মহাপুরুষ আসছেন। ঘণ্টার শব্দ পেলে বুঝত রাজা আসছেন হাতী নিয়ে, কিংবা রাজার পোস্ট-শেজ বিউগল বাজিয়ে আসছে। সিপাই সওয়ার আগে দেখলে বুঝত সাহেব

বাহাদুর ডাক বাংলায় আর কারো মেম নিয়ে আসছেন, তার পর-দিন তার স্বামীর সঙ্গে 'ডুএল' খেলা হবে। যদি কেবল ধূলো দেখা যেত কোন শব্দ নেই তাহলে বুঝত সরকারী বুলক ট্রেন আসছে, সর্বনাশ! ৩ দিন ধূলো উড়বে!

কালা আদমীর যেমন সরাই বা মুসাফির খানা ছিল, সাহেবদের মহা আকর্ষণ ছিল তিন মাইল অন্তর ডাক বাংলা। 'ডাক বসাবার' ঘোড়া এখানে দেদার থাকত, আর সহিস কোচমান বাউরচি, ভিস্তি, ধোবী, বেয়ারার, মেথর, মশালচি, আবদার (জল সরবরাহকারী) বাঙ্গালী কেরানী ইত্যাদি গ্রাণ্ডট্রংকের ডাক বাংলা গুলজার করে রাখত। গ্রাণ্ডট্রংকের খাপরা বা পাকা চাল বাংলা কোম্পানীর সাহেবদের মস্ত আড্ডা ছিল। নাচও হত।

ডাক গাড়ীতে কেবল সাহেবরাই যেত, দৈবাৎ কালা আদমী। কলকাতার অফিস যান যেমন ছিল, বেশির ভাগ সেই রকম। দুটো ঘোড়া টানত। এক মাইল থাকতে কোচমান বিউগল বাজাত 'তু-তু-তু-তুঁয়া তুঁয়া'। তাই শুনে ডাক বাংলার সহিস দুটো তাজা ঘোড়া তৈরী রাখত। কেউ হল্‌ট করবার থাকলে নেমে ডাক বাংলায় রাত কাটাত, বাকী প্যাসেঞ্জার সোজা চলে যেত। যদি সাহেবের মনে ভয় হত তবে এক সওয়ার ১ মাইল পর্যন্ত ফ্রী এসকর্ট হত। কালা আদমী পায়ে হেঁটে, শামপুনিতে বা গরু গাড়ীতে গেলেও এই এসকর্ট পেত। পালকিতে চাকা লাগালে যেমন গাড়ী হয় তাকে শামপুনি বলত। আমি মুঙ্গেরে শামপুনি, এবং চৌরঙ্গীতে সেডান চেয়ার দেখেছি।

বিউগল বাজিয়ে ডাকত বলে ঘোড়ার ডাক, 'ডাক' বাংলা,

চিঠির 'ডাক' এসে এসে ভাষায় ঢুকলো। যে লোক কাঁধে ঘুন্টি বাঁধা লাঠি নিয়ে ঝুম ঝুম করে চিঠির থলে পিঠে ঝুলিয়ে (সেই শব্দে বাঘ ভালুক তাড়িয়ে) ছুটত তাকে 'ডাক রানার' বা 'রানার' বলত। বাঁকে করে পার্শেল যেত তাকে 'বাংঘি পোস্ট' বলত। এটাকে এখন 'পার্সেল পোস্ট' বলে। প্রেসিডেন্সি পোস্ট মাস্টার হালে আমাকে লিখেছেন 'তোমার পত্র পেয়ে রেকর্ড খুঁজে বাংঘি পোস্টের মানে পেলাম না। গ্রাণ্ডট্রাংক ভ্রমণশীলা আমার নিরক্ষরা দিদিমার রেকর্ডই যথেষ্ট।

ঘোড়ার ডাক গাড়ীতে যে চিঠি যেত তার মাশুল আট আনা প্রথমে ছিল। গ্রাণ্ডট্রাংকের ডাকবাংলাতেই চিঠির থলে নামত। 'বেয়ারিং চিঠি' কথাটা প্রচলিত হ'ল। এটা ইংল্যাণ্ডে চলিত নেই। ফাউলার আমাকে লিখেছিলেন, 'এটা ইংরেজীই নয়।' বাবু ইংলিশ নাকি?

কোম্পানির ইংরেজরা বানান করত—

Dok-Dawk-Dak.

'Lay on a Dok of forty-eight horses from Cawnpore to Allahabad.'

বেনারস থেকে এই হুকুম কানপুর পৌছুলে সেখান থেকে ডাক বসে যেত। কোন রাজাধিরাজ বা সাহেব ইতিমধ্যে বেনারস থেকে এলাহাবাদ ৪৮ ঘোড়া বসিয়ে ফেলেছেন। অশ্বপদ শব্দে গ্রাণ্ডট্রাংক মুখরিত।

তিনি নিজের 'ডাকে' এলাহাবাদ পৌছে কানপুর থেকে বসানো ডাকে তৎক্ষণাৎ কানপুর রওনা হলেন। এ বন্দোবস্ত সাধারণ ডাক গাড়িরও ছিল।

টাইগ্রিস নদীর বেগ থেকে যেমন 'টাইগার' শব্দ হয়েছে তেমনি বিউগলের ডাক থেকে ঘোড়ার 'ডাক' সৃষ্টি। বাঙালী কেরানী

বিউগল শুনে সহিসকে সতর্ক করতো, 'ডাক শুনতা হ্যায়? ঘোড়া হাজির রাখো!'

হিন্দুস্থানী সহিস এবং কোম্পানির সাহেবরা এই বাংলা শব্দ 'ডাক' শিখলো। 'আওয়াজ আতা হ্যায়' 'গাড়ী আতা হ্যায়' না বলে 'ডাক আতা হ্যায়' বলতে শুরু করলো।

অক্সফোর্ড যদিও বলেন 'ডাক' হিন্দী, আমার নিজের ধারণা এ শব্দ বাংলা থেকে হিন্দী এবং আংলোইনডিয়ান হয়ে গেছে।

'হাঁক' বরং হিন্দী। 'মুদ্দেই মুদ্দালে হাজির।' কোর্ট পিওনের হাঁককে, এক কালে নিলামের ডাককে, এবং বন থেকে চেঁচিয়ে কানেস্তারা পিটে বাঘ বের করাকে 'হাঁকোয়া' বলত।

বিলাতে 'ডাক' চলে না। লর্ড মেকলের লেখায় ও ইংলিশ নভেলে 'চেঞ্জ অফ হরসেস' আছে। কদাচিৎ 'রি-লে'।

১৮৫৫তে যখন হাওড়া-রাজমহল রেল চললো তখন কোম্পানির বুলক ট্রেন উঠে গেল। সেই গ্রাণ্ডট্রংক ধরেই প্রায় বুলকট্রেনের বেটা ছুটলো, নাম হল নাইট ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, পরে কর্ড মেল, পরে পঞ্জাব মেল, এখন ৭৩ অপ অমৃতসর মেল।

এখন গ্রাণ্ডট্রংক তার গৌরব ভাবে না, তার জলুশ চলে গেছে, সে আত্মজীবন ভুলে গেছে; লৌহ প্রতিযোগিনী তাকে বাল্য সখী বলেও মানে না; ৭৩ অপ বাষ্পীয় দর্পে ভাবে না যে তার পূর্ব-পুরুষ ছিল বিচালি চিবানো বুলক ট্রেনের বলদ। রাজাধিরাজ যখন স্পেশাল ট্রেনে যেতে যেতে জঙ্গলের অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে এক টুকরা জোনাকি শোভিত গ্রাণ্ডট্রংক দেখেন, মনেও ভাবেন না তাঁর পূর্ব-পুরুষ এই রাস্তাতেই ধন-দর্পে তাঁর মহান আত্মগরিমা দেখাতেন।

মিউটিনিতে দানাপুর

"দানাপুর ক্যান্টনমেণ্টে ড্রাই ক্যানটিনে কর্নেল সাহেব বসে লিখছেন। এক সিপাহী সামনেকার পথে গস্ত করছে। যতবার বন্দুক ঘাড়ে যাতায়াত করছে ততবার সাহেবের দিকে তাকিয়ে তার রাগ বেড়ে যাচ্ছে।

"আর রোষ সামলানো গেল না। সিপাহী দাঁড়াল, সাহেবের দিকে তাকাল, ক্রোধ মাথায় চড়ল, বন্দুক নিশান করে দড়াম করে ফায়ার করল।"

"কালা গোরা মারা রে! কালা গোরা মারা!" সংবাদ দেখতে দেখতে দানাপুর পাটনা ছড়িয়ে গেল। ৩০৲ নৌকার দৈনিক বায়না ৬০৲তে উঠল; ২০৲ গরুর গাড়ির দৈনিক রিটেনিং ফি ৪০৲ চড়লো। রোজ সকালে ৮টার মধ্যে যদি টাকা কেউ জমা না দিত তাহলে নৌকা ও গাড়ি হাতছাড়া হয়ে যেত।"

এই রোমাঞ্চকর কাহিনী দানাপুরের জগন্মোহিনী দত্ত ৭০ বছর পূর্বে আমাদের বলতেন ও অতিকষ্টে শোক সম্বরণ করতেন। তিনি জানালা দিয়ে মিউটিনি দেখতেন এবং অবশেষে সর্বস্ব ত্যাগ করে হঠাৎ প্রাণ নিয়ে পালালেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখলেন, না পালালে চলে কি না।

পালানো কি মুখের কথা? ১৯৪৬ সালে ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শনের সময়, ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের সময় কি পালানো সহজ হয়েছিল? 'কালা গোরা মারা!' ধ্বনি মুখে মুখে ছুটল, যেন হাওয়ায়

বেড়াতে লাগল। এর কি অর্থ লোকের বুঝতে বাকি রইল না। দীর্ঘসূত্রতা ও গড়িমসির পর মিউটিনি নিজের আকার ধারণ করলে।

টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছিল। ই. আই. আর ওদিকে তখন চালু হয় নি, কেবল হাওড়া থেকে রাজমহল চলছিল। ঘোড়ার ডাক গাড়িও বন্ধ হ'ল।

জগন্মোহিনীর বাড়ির হাতায় আমিন-দশেরি গাছে আম ফলেছে, একটা লিচুগাছ লাল টকটকে ফলে ভরে উঠেছে। নেবুগাছে হাজারখানেক পাতিনেবু, পেঁপে গাছগুলো কাঁচা ফলে সেজে দাঁড়িয়ে আছে। কলাবাগানে মালভোগ কলা পাকছে। ২০টা গরু। তিন কড়াই দুধ তিনটা উনুনে চড়েই আছে; "এস জন ব'স জন এল, এক লোটা দুধ খেয়ে গেল।" তিনটা বুড়ি বসে দুধ জ্বাল দিত। একদিন একটা বুড়ি দুধে ফুঁ দিয়েছে, ভুড়ভুড়ি বন্ধ করবে বলে। জগন্মোহিনী তাকে বললেন, "কেয়া কৈলি গে বুড়িও? দুধুয়া ঝুঠার দেলী?" এবং এক কড়াই দুধ (এখন আমরা যেমন বালতির জল ফেলি) হুড় হুড় করে মুরিতে ঢেলে দিলেন। "গাইয়া ফিন দুহো" হুকুম হলো। বাড়ি চাকরে গিশগিশ করছে। "দুধ লাও! ছিলিম ফুঁক!" বৈঠকখানার বাবুদের এই হরদম কথা। চা ছিল না।

এই সব ছেড়ে একখানি মাত্র গরুর গাড়িতে পালানো অতি কষ্টকর। গাড়ি নৌকার ভয়ানক অনটন। সকলেই পালাবার জন্য যানবাহন তৈরী রেখেছে। বেলা একটার সময় জগন্মোহিনী শুনলেন, 'তুঁয়া! তুঁয়া!' করে হঠাৎ বিউগ্‌ল বেজে উঠল। জানালা খুলে দেখলেন চার হাজার সিপাই ডাল-রুটি ফেলে পোশাক পরে বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে গেল।

"আমি তখন কয়েক বস্তা টাকা নিয়ে ছ মাসের মেয়ে লক্ষ্মীকে কোঁথায় পুঁটুলী বেঁধে কাঁদতে কাঁদতে ভরা সংসার ডুবিয়ে দিয়ে গরুর গাড়িতে চড়লাম।" কত্তারা অর্থাৎ খুকির পিতা নৃত্যগোপাল দত্ত (যিনি বস্তা বস্তা টাকা জমিয়েছিলেন), তাঁর বন্ধু ইত্যাদি হুঁকো হাতে পায়ে হেঁটে গাড়ির সঙ্গে চললেন। সূর্যদেব আগুন ঢালছেন। ধনসম্পদ ও বৈভবের কি অবস্থান্তর প্রাপ্তি!

জলপথ আরো বিপজ্জনক হ'ত। যত সাহেব জলপথে পালিয়েছে সব গোলা খেয়ে ডুবেছে। বাঙ্গলা মুল্লুক যাবার বড় রাস্তা কোথাও লোকারণ্য কোথাও বা নির্জন। মাঝে মাঝে বা প্রত্যেক সরাইয়ে ঘোড়সোয়ার থাকতো। কেউ বেশী ভয় পেলে এক মাইল সঙ্গে গিয়ে ভরসা দিত।

সামপুনি, ডুলি, গরুর গাড়ি, ঘোড়া, উটের গাড়ি, হাতি, রাস্তা ধরে বর্দ্ধমানের দিকে চলেছে এক মাসের পথ ২৭০ মাইল। যে সেপাইদের ইংরেজের সঙ্গে লড়তে ইচ্ছা নেই তারা বাঙ্গালী মারবার জন্য পথের পাশে পাশে বৃক্ষ আবরণে তরোয়াল নিয়ে চলছে। যাঁরা পালাচ্ছেন একথা জানতেন তাই টাকার তোড়া রাস্তার ধারে পুঁতে ফেললেন,—এই আশায় আবার পরে পাব। বাকী রাশি রাশি থলেভরা কনট্র্যাক্টারি টাকা বাড়িতে পুঁতে রেখে আসা হল। দরজায় তালা পড়ল। তার পরদিনই আগুন লাগিয়ে বাড়ী পোড়ানো হল। টাকা লুঠ হল।

হিন্দুর তৈরী রুটি মুসলমান খেত ও মুসলমানের রুটি হিন্দু খেত। চাপাটি বিতরণের "এক জাত এক উদ্দেশ্য" মানে। বাঙ্গালী সাহেবের গোলামী করতো, ঠিকেদারী করতো, এই অপরাধ, কোন

বাঙ্গালী যদি কোন সেপাইকে বলত, "তোম ভি তো তনখা লিয়া, কমান্ড্যাণ্ট কো সেলাম ঠোকা।" সেপাইভায়া উত্তর দিতেন, 'দেশ কি ওয়াস্তে, পেট কি ওয়াস্তে নেহি।'

একটি বাঙ্গালী ছোকরা হেঁটে পালাচ্ছেন বর্ধমান। ট্যাঁকে মাত্র একটি টাকা! এক সেপাই তার পেছু নিয়েছে। এঁকে-বেঁকে জঙ্গল দিয়ে তাই ছোকরা চলেছে। যেমন খিদে তেমনি তেষ্টা। একটা ছোট মাঠে গাছের ছাওয়ায় বেশ ঘাস গজিয়েছে। একটা লোক কাস্তে দিয়ে কেটে সেইখানে একগাদা ঘাস জমিয়ে রেখেছে। ডোবায় জলও আছে।

দূর থেকে আওয়াজ এল, "কোই বাঙ্গালী এস্নে বা? ময়দান নিমন বাটে, পানি নিমন বাটে; এই ঘাসিয়াড়া, কোই বাঙ্গালী তো ইধর ঝাঁকি নহি মারিস?"

ছোকরা আগেই টাকাটা ঘেসেড়াকে নিয়ে ঘাসের গাদার ভেতর লুকিয়ে শুয়ে পড়েছে। বুঝি শুনেই বুঝেছিল যে, আরা জেলার সিপাইয়ের হাতে নিস্তার নেই।

ঘেসেড়া ব'লল, "নেই সরকার, ইধার কৈ বাঙ্গালী নেহি আয়া।" সিপাই চলে গেল। 'বিপদভঞ্জন নারায়ণ!' বলে ঘাস ঝেড়ে উঠে বাঙ্গালী ছোকরা চম্পট দিল।

মাঠ দিয়ে কিছুদূর গিয়েই দেখল আবার একটা তরোয়ালধারী সেপাই। "বিপদে দয়া কর প্রভু!" ছোকরা চিৎকার করল। সেপাই তখনি তার কান ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিচে একটা ভূলুণ্ঠিত তালগাছের গুঁড়ির ওপর তাকে বসিয়ে নিজের পাশে বসে বললে, "পরভু দয়া করনে সকতা, লেকিন সিপাই তুমে দয়া কভি নেই

করেগা; তুমকো আব কতল করেঙ্গে।" "জল পিয়েঙ্গে সিপাইজি, ময় পিয়াসী হুঁ" বাঙ্গালী বলল। সেই সময়েই ছোকরার চোখ ঝলসে 'ভাতিল কৃপাণবর;' কিন্তু সে ঝলস একটু বেশিক্ষণ খেলল, তাতে ছেলেটি বুঝল যে, বাহুতে দ্বিধা এসে গেছে।

"পিও তাজা মিঠা খজুর কে রস" সেপাই বলল এবং ছোট মানুষ সমান (মুঙ্গের জেলার মত পাটনা জেলার খেজুর গাছ বড় হয় না) এক খেজুর গাছ থেকে কেটিয়া পেড়ে ছোকরাকে দিল। বলল, "যব তক কেটিয়া ভর রস তুমরা পেট মে সব নেহি জায়গা তব তক হাম নেই কতল করুঙ্গা।"

ছেলেটি মুখে ভাঁড় দিয়ে চোঁ-চোঁ করে খেতে লাগল। 'আধ কেটিয়া পার করে হাতে কেটিয়া রেখে বললে, 'আউর নেই পিয়েঙ্গে।' ফটাস করে কেটিয়া মাটিতে ফেলে ভেঙ্গে দিল। শুখ্‌না জমি চোঁৎ করে রস টেনে নিল।

"হো হো বাঙ্গালী বড়া চতুর হেই! তেরা জান বাঁচ গিয়া, সব রস পেট মে নেহি পৌছা; হাম বেরেইলি কি সাচ্চা আদমি, জবান ঠিক রাখেঙ্গে; কাঁহা তেরা ঘর হায় লউন্‌ডা?"

ছোকরা বলল; "বর্ধমান, আপ মেরে ডেরামে আইয়ে গা ঘোষবাগান।"

"জরুর সে জরুর! কেয়া খেলাও গে বাঙ্গালীবাবু? রসগুল্লা, সীতাকি ভোগ, মতিচুর?"

লউন্‌ড়া মানে ছোঁড়া, ধামিন মানে ছুঁড়ি। সেপাই অবজ্ঞা ছেড়ে এবার সীতাভোগের লোভে বাবু বলেছে, আর বলল, "বাঙ্গলা মে বোলো, হাম সমঝতে হে।"

ছেলেটি বলল, "সীতাভোগ তো খাওয়াবই সিপাই সাহেব, আর তোমার নাকে তালপট্কা ও কানে ছুঁচোবাজী দেব।" সিপাহী মনে ভাবলে আতর-গোলাপের মতন তুলায় ভিজিয়ে নাকে-কানে কোন জিনিস দিয়ে অভ্যর্থনা হবে।

তার মনের গান সেপাই গাইল, "চল্ চল্ গলে পর রুখি, শমশের!" এই গানটাই ছোক্‌রাকে বাঁচিয়েছে তরোয়ালকে হচ্ছে গলার কাছে এসে থেমে যা। অথবা 'তুই গলার উপর শুখ্ মো চল্, ভেজাস নি।

এ গান ছাড়া দ্বিধার আর একটা কারণ আছে,—তৃষ্ণায় জল প্রার্থনা। জল খেতে চাইলেই শত্রুর উপর দয়া হয়, তরোয়াল হার মানে। এর ব্যাখ্যায় আমরা অসমর্থ। সাইকলজি এখানে মূক। জয়দেব জানতেন যে, এই হচ্ছে ধর্ম। তিনি লিখে গেছেন যে, রাধিকা যখন রেগে গর গর করতেন, আর বেহায়া কৃষ্ণ যখন বলতেন, "আমার বড় পিপাসা, দেহি মুখ কমল মধু পানম্" তখন রাধার রাগ গোসা মান দশসালা বিশসালা পরিকল্পনার মতন বানচাল হয়ে যেত, আর তিনি আগ্রহের সঙ্গে বেচারার তৃষ্ণা মিটাতেন।

জলদান পুণ্য জন্যই এতবড় মিউটিনি সম্ভব হয়েছিল; হিন্দুর কুয়াতে এক সিপাই লোটায় জল তুলছেন। সেই ছাউনিতেই মুসলমানের আলাদা কুয়া একটু দূরে আছে। এক মুসলমান সৈনিক বদনা হাতে যাচ্ছে। শরীর অসুস্থ, হেঁটে যেতে পারবে না, হিন্দুর কুয়ার কাছে থপ করে বেচারি বসে পড়ল। বলল, "ভেইয়া এক লোটিয়া পানি মেরে বদনামে ঢাল দেও, মেরা তবিয়ত ঠিক নায়।"

হিন্দু বলল, "পানি কো লেকির সে লোটামে ছুৎ আ যাইগি, মাপ করো মিয়া, মেরা জাত চলে যাইগি।"

মুসলমান হাসতে হাসতে বললে, "জাত? না তেরা না মেরা জাত হ্যায় ভেইয়া! বন্দুক কি টোটা দাঁত সে কাটতে হো কি নেহি? কোন্ জানোয়ার কি চরবী হ্যায় তুমে মালুম নেহি কা? মুঝে পিয়াস লাগ্‌গি হ্যায় ভেইয়া।"

হৃদয় থেকে অনুকম্পা উছ্‌লে হিন্দু সিপাইকে অভিভূত করল। লোটার জল বদনাতে ঢেলে দিল, তার পর মুসলমানকে বুকে চেপে আলিঙ্গন করল, 'মেরে ভাইরে! এক ভগবান কে বেটা রে! মারো গোলি! তোপ দাগা হ্যায় কৈ রে?' শুরু হ'ল ব'লে।

এতবড় সদ্‌ভাব হিন্দু-মুসলমানে আর কখনো হয় নি, হবেও না। কিন্তু এই সৌহার্দ্য জাত রক্ষার জন্যই হয়েছিল, যদিও অনেক আলাদা ঐতিহাসিক কারণ ছিল। দানাপুর কালীবাড়িতে খাতায় এক কবিতা মিউটিনির পর কেউ লিখেছিল:—

জাত রাখ উপদেশ শুন মোর ভাই,
মন থেকে দূর করো 'এ খাই ও খাই'।
জাত হৈতু একদিন কাঁপিলা মেদিনী
দাঁতে টোটা কেটে ঘটে সিপাই মিউটিনি।

এই সব বন্ধুত্বের খবর যেমন মুখে মুখে প্রচার হ'ল অমনি সাহেবরা ভয়ে জড়সড় হয়ে উঠলেন। কিছুদিন পরেই তুমুল চিৎকার, তরোয়ালের ঝনঝনা, বন্দুকের দুড়ুম দাড়াম। সিপাই দল গর্জে উঠল, ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত ভূমিকম্প পৌঁছুল। দানাপুরে রক্তের স্রোত বয়ে গেল।

দানাপুরের কালিদাস ঘোষ স্বচক্ষে মিউটিনি দেখেছিলেন। তিনি বলে যেতেন, ছেলেবেলায় আমরা দারভাঙ্গায় বসে শুনতাম। তিনি বললেন, "আমাদের পালাবার তিন দিন আগে চার হাজার জোয়ান কালেকটার সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়ে হড় হুড় করে বন্দুক ছুড়লো।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদু, কালেক্টর সাহেব মরল ত?" তিনি বললেন, "কি গাধা রে! কালেকটার কি ছিল সেখানে, সে আগেই চম্পট দিয়েছে!" যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। মিলিটারী ও সিভল সাহেবরা ছদ্মবেশে পালাত; তার মধ্যে মিস্টার কার্ভিনোর নাম বিখ্যাত; ৮০ বৎসরের পুরান অ্যামেরিকান ইতিহাসে পরিচয় গোপনের স্থন্দর ছবি আছে।

কালিদাস ঘোষ দেখেছিলেন ও বলতেন, 'পহলে বাঁবালোগকো কাটা, যব মেমলোগ রোনে লাগে তব মেম লোগ কো কাটা, যব সাহেব লোগ রোনে লাগা তব সাহেব লোক্‌কো শির খচাখচ উড়ায় দিয়া।' উত্তেজিত হলেই তিনি হিন্দি বলতেন, যেমন অনেকে ইংরিজি বলে। সাহেবদের ঘরে ঢুকে তরোয়ালেতেই কাজ হাসিল হ'ত। বন্দুকে অত মজা হ'ত না। বাঙ্গালী বিদ্বেষ বেড়ে আসছে তবু তিনি নির্ভয়ে 'সাহেববধ' মহাকাব্যর প্রকৃত বিশুদ্ধ সংস্করণ দেখে যেতেন।

নিজে এ সব চক্ষে দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, দানাপুরের মতন বিদ্রোহ কোথাও হয় নি,—দিল্লী, কানপুর, লখনউএও নয়। মিরাট লুধিয়ানাতেও নয়। এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কেউ যদি বলত এলাহাবাদেও মিউটিনি হয়েছিল তিনি রেগে বলতেন,

"দানাপুর রয়েল সিটি, এর মতন আর কোন শহর সাহেব শোণিতে প্লাবিত হয় নি।"

কালিদাস ঘোষের শ্বশুরবাড়ি ভান্তাড়া গ্রামে। একজন রঙ্গ করে জিজ্ঞাসা ক'রল, "দাদু, ভান্তাড়াতে মিউটিনি হয়েছিল?" বৃদ্ধ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "আরে, ভান্তাড়া তো আস্তাকুঁড়,—পাঁদাড়, সেখানে কি জেনারেল হ্যাভলক যায়, না সেখানে নানাসাহেব সাহেব কাটে, না জঙ্গবাহাদুর গোলঘরের মাথায় চড়ে দূরবীন করে দেখে সেপাইরা কোথায় যাচ্ছে? না কি সার জেমস উটরাম ভান্তাড়ায় বীরত্ব দেখাতে যাবে।"

একজন বললে, "গোলঘর কি দাদু?" দাদু আবার রেগে টং। "গোলঘর জান না? পাটনায় ওয়ারেন হেস্টিংস একটা প্রকাণ্ড বাড়ি বসিয়ে গেছে। তার ভেতর একবার 'হেই' বললে ১৮ বার 'হেই হেই' শব্দ ওপরে ওঠে ও ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়। আশ্চর্য প্রতিধ্বনি। ষ্ট্র্যাণ্ড মাগাজিনে এর ফটো ও কাহিনী বেরিয়েছে। ১৪০টা সিঁড়ি বাহির দিক দিয়ে। এই সিঁড়ি ধরে জঙ্গবাহাদুর ঘোড়ায় চড়ে উঠে ছাদে পৌঁছে টেলেসকোপ দিয়া দেখতেন। একদিন দেখলেন, একপাল সাহেব মেম দানাপুর পাটনা থেকে গোটাকতক দেশি নৌকায় নিজেরা দাঁড় টেনে এ পার থেকে ওপারে পালিয়ে যাচ্ছে। যখন তারা মাঝ দরিয়ায় তখন নানাসাহেব যেমন কানপুরে করেছিলেন তেমনি 'গোলা দাগো!' ব'লে একদল সেপাহী আরটিলারী হড় হড় হড়াৎ করে দু-চার গুলি ছুঁড়ে সাহেব ব্যাটাদের মারলে ও নৌকা ডুবি হ'ল। সে একদিন গেছে রে! ইচ্ছে হয় আবার মিউটিনি দেখি।"

আমাদের মধ্যে এক রকাট ছেলে, যে ইস্কুলে অঙ্কে শূন্য পেত, সে বলল, "কত সাহেব মেম ওপারে পৌছুল?" দাদু বললেন, "একটা সাহেব বিপত্নীক হয়ে পারে পৌছুল, আর একটা মেম বিধবা হয়ে পারে পৌছুল। তাদের দুইজনের কুকুরের মতন মুখ শোঁকাশুঁকি করে বিয়ে হ'ল; আর সব জলেই গোরপ্রাপ্ত হ'ল,—সেই জলটাকে এখনও লোকে কবরগাঁও বলে। গাছের ওপর তাদের মধুশশী পালন হ'ল।

একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করল, "বিয়ে না করলে কি চলতো না?" দাদু বললেন, "কি বোকা রে তুই? কোন কেলাসে পড়িস? পরপুরুষের সঙ্গে মেম মাঠ ভেঙ্গে কি করে যাবে? লোকে বলবে কি? নৌকা থেকে ত্যক্ত নারী ও পুরুষের বিয়ে হয়েই থাকে; এক ডেপুটি উপন্যাসে বলতেন, নবকুমার, আপনার সহিত পলায়ন কপালকুণ্ডলার একমাত্র উপায়। যখন আত্মীয়স্বজন জিজ্ঞাসিবে এ কাহার স্ত্রী, কি উত্তর দিবেন? আপনি ইহাকে বিবাহ করুন কেহ কোন কথা বলিবে না। বাজনা নেই, বাত্তি নেই, লুচি নেই, দই নেই, সন্দেশ নেই, বিয়ে হয়ে গেল। অধিকারী ঘটক হয়েছিল। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা দুজনেই নৌকা থেকে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। নৌকা ডোবার এই পরিণাম।

রাধানাথ ঘোষাল সোজা বর্ধমান পালাতে পারেন নি। তিনি দানাপুরের কাছাকাছি কোনও একটা গ্রামে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতেন,—কপশপুর, খোচপুরা, মহুয়াবাগ, গর্ভুচক। তিনি ৭০ বৎসর পূর্বে আমাকে বলেছিলেন, বর্ণসংকরের আতঙ্কে অর্জুন যুদ্ধে নামতে দ্বিধা করতেন। ঠিক কথা রে। ভীষণ দৃশ্য দেখেছি। দানাপুর ও কপশপুর

গ্রামে অনেক সুন্দরী কুমারী আশ্রয় নিয়েছিল। একদিন দেখলাম আমাদের দানাপুরের একটা ষোড়শী যে আমার কুয়াতে জল তুলতো, পরমাসুন্দরী রামকুমুরী বসে কাঁদছে। তার চার দিকে তার মা ভগিনীরা বসে কাঁদছে। রামকুমুরী অবিবাহিতা। মিউটিনি প্রায় ছয় মাস পুরানো হয়েছে। বাবুজি রামকুমুরী মেরি দোপস্তা হই, কেয়া করনা চাহি? আমি বললাম, মেটিয়া সিন্দুর লাও মাঈ। সিন্দুর হাতে নিয়ে আমি মন্ত্র পড়লাম, মাধব মাধব বাচী, মাধব মাধব হৃদি এবং মন্ত্রপূত সিন্দুর তার মা'র হাতে দিয়ে বললাম, উস্‌কো কপার মে লেপ চড়াও। তেল সিঁদুর প্রলেপ পড়লো, শুভ-বিবাহ হয়ে গেল। স্বামী অজ্ঞাত,—উধাও, সেই সিপাহী ভায়া হয়তো কানপুর লখনউয়ে লড়েছেন, মরেছেন, এদিকে এক তরুণী ভিকৃরির মতন বিয়ে হ'ল। শহর থেকে যারা পালায় নি এ রকম অনেক কুমারী অন্তর্বত্নী হয়েছিল।

"হামলের লচ্ছন" প্রকাশ পেলেই শহরে বা গ্রামে কান্নাকাটি পড়ে যেত। সান্ত্বনা দেবার জন্য তাই এইরূপ কাহিনীকে বৈঠাকুর গানে পবিত্র করেছেন, মাতৃরূপ প্রদান করে:—

"ক্রমে ক্রমে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছেন—
মৃত্তিকায় শয়ন, মৃত্তিকা ভোজন,
এ-এ-এ স্তনাগ্র ঘোর কৃষ্টিয় বর্ণ,
এখানে-এ-এ-একি আয়োজন?
দিলেন শ্রীহরি সন্তানের তরে
অকৃত্রিম দুগ্ধ মাতৃ-পয়োধরে।

একদা শ্রীকৃষ্ণ অতি মনোদুখে
হইয়া ক্ষুধার্ত গান শিশুমুখে—
এস দেবকী ঈ-ঈ
এস দেবকী-ঈ ঈ
স্তন দুগ্ধ দাও না মুখে।"

বিলাতি war baby অপেক্ষা এ সন্তানের মান বেশী, কারণ মাতা নির্দোষ। এক তরফা বিয়েও ঘটেছে।

রামকুম্‌রী বললে, "চুনরী রঙ্গাওলে ?" অর্থাৎ বিয়ের কাপড় রঙ্গিয়েছ ? তার পতিভক্তি এসে গেছে। "হাম গোদনা গোদাই ঠাকুর ঘোষাল জি ? বললাম, "হাঁ জরুর।" উল্কিকে গোদনা বলে।

[illegible] দিন পরে দেখলাম স্বামীর নাম রেখেছে কিষন। সেই পবিত্র নাম [illegible]তে রচিত করেছে। আদর করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আ গে বাগিন্! গোদনা গোদাইলি গে ?" রামকুম্‌রী হেসে বলল, "ত-অ-ব ?" মুখে হাসি ফুটিয়েছে সিঁদুর! সিঁদুর সতীত্ব দান করে। সিঁদুর কৌটোর গান :—

কাঁচা মাথায় সিঁদুর পরে
পাকা মাথায় প'রো।
স্বামীর ঘর সুখে করে
স্বামীর আগে মর।

[illegible]পুর ও [illegible]টনার মাঝখানে অনেক গণ্ডগ্রাম আছে। যখন খবর আসত-সিপাহী পল্টন আতা হায়, জোয়ান ছুকুরীরা সব ভাগো, এই [illegible]র্কবাণী শুনে যুবতীরা সব চোঁ চোঁ পালাত। একবার একটী আশী বছরের বুড়িও তাদের সঙ্গে পালাতে উদ্যত হল।

লোকে তাকে বলল, "তুম কাহে ভাগ্‌তা গে বুড়িও? তুমে ক্যা ডর হ্যায়?" বুড়িয়া কাঁদতে লাগ্‌ল, বললে, "আগর পণ্টন মে কই বুড়া সিপাহী রহে তব?"

আমেরিকান ইতিহাসে ইংরেজের কোন অত্যাচার লুকানো নেই। দানাপুর মিউটিনির এরিয়ার ভিতর নেই। যা শুনেছি তাই বললাম। দানাপুরে কি করে মিউটিনি শেষ হল বুঝতে গেলে অন্য শহরের কথা জানা দরকার। আমেরিকান History cf the World বলেন :—

"In march 1858 Sir Colin Campbell the new C-in C. conquered Lucknow and permitted the British troops to plunder and murder to their heart's content. In every house were the dead and the dying, and the corpses of the Sepoys lay piled up several feet in height. The booty the soldiers carried off in the way of jewellery and treasure of every kind was enormous."

ইংরেজ জিতে লখনউএর পর এলাহাবাদ লুটের হুকুম দিলেন। গোরা লোগ খুব লুটা ও বেইজ্জৎ কিয়া। তার পর এলাহাবাদের সিটি রোডে সারি সারি নিরীহ নেটিভ নিগারদের ফাঁসি লটকে দেওয়া হল। শুকনো মড়া খটাখট হাওয়ায় দুলতে লাগলো। তার পরে জেনারেল পার্ডন হন। দানাপুরেও নিশ্চয় কিছু এই রকম প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জগন্মোহিনী দত্ত, কালিদাস ঘোষ এ বিষয়ে নির্বাক ছিলেন। তাঁরা দানাপুর ফিরে যান নি। ইতিহাস কিছু লেখে না।

গ্রাণ্ড ট্রংক রোডে ত্বপাশে জঙ্গলে যে বস্তা বস্তা টাকা যাত্রীরা পুঁতে রেখে বর্ধমানের দিকে পালিয়েছিল, তা কেউ তো খুঁড়ে দেখল না! এখন যদি খুঁড়ি তা হলে কয় ক্রোর বেরুবে ঠিক নেই। ট্রেজারট্রোভ অ্যাক্টে তুমি আমি পাব না।

নোট হুণ্ডি ইত্যাদির কোন কথা শুনি নি। লোকে টাকাই দেখত।

মাটি খোঁড়বার চেষ্টা বোধহয় তখনই কিছু কিছু হয়েছিল। একটা ডানপিটে বাঙ্গালীর ছেলে রয়েল টাইগারের চামড়ার চাপকান পরে ও তারই নাইট ক্যাপ পরে চার থাবায় চলে বেড়াত। গরুর গাড়ির যাত্রীদের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইত। বলত, 'ভয় নাই মা, আমি বাঘ নয়, সেপাইয়ের ভয়ে বাঘ সেজে বেড়াই।" তার থাবায় ছোট একটি শাবল ছিল। রাতারাতি বড়মানুষ হবার চেষ্টা। হয়েও ছিল অনেক লোক বিপুল বড়মানুষ, অগাধ ধনসম্পত্তিতে গড়িয়ে বেড়াত।

আনন্দ রায়, কৈলাস চাটুজ্যে ইত্যাদি যাঁরা দানাপুর থেকে মে মাসে (১৮৫৭) পালিয়েছিলেন তাঁরা বলতেন, "সেপাইরা ভুট্টার ক্ষেত উজাড় করে মার্চ করে উত্তর-পশ্চিম চলে গেল; আর কোন খাবার জোটে নি; গ্রামে যত চাবেনা ছিল তা তো উবে গেলই।"

কিন্তু কথা হচ্ছে মে মাসে ভুট্টা এল কি করে? দানাপুরের ভুট্টা চাষী সুমাক মাতো আমাকে বলেছে, "হাঁ উস বকৃত হোতা থা। উসকো পটউয়া ভুট্টা বোলা যাতা হায়, হাজারো কুঁয়া থোকে ঢেঁকু সে পানী পটায়া যাতা থা। লাটঠা লাখো থা।" জল তোলবার কলের নাম এই।

পটউয়া ভুট্টা এত সুন্দর গাছে ফলে থাকতো সে হিন্দি কবিতায় দেখা যায়, সবুজ রং ও দানায় ভরা :—

ছরি থি
তোরি ঘি
জোশালা গুড়কে থাড়ি ঘি
সিপাই মারে ছড়ি
বেহুঁস হো কে গিরি।

১৩৫৯

মীরাটে মিউটিনি

তুঁয়া—তুঁয়া—তুঁয়া—সেপাইয়ের দাম্ভিক বিউগ্‌ল আস্ফালন ক'রে উঠ্‌ল মীরাটে ঠিক ১০ই মে ১৮৫৭, কেউ বলে ভোরে, কেউ বলে পরে। এই রবিবারে মিউটিনি উৎসবের আসল সূত্রপাত। এর কিছু পূর্বে যে সব ঘটনা হয়ে গেছে মঙ্গল পাঁড়ের অমঙ্গল ইত্যাদি সে সব সারে-গা-মা সাধা হচ্ছিল মাত্র।

মীরাটের আনন্দ রায় (বাড়ি কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম, বর্ধমান) আমাকে ৭৪ বছর পূর্বে বামুনপাড়ায় বলেছিলেন, "পালাব কি রে? কোথা কেমন করে পালাব? কোথা নিরাপদ হব? আমরা জানতাম মীরাটে প্রত্যেক সাহেব ও বাঙ্গালীর বাড়ি শোণিতরঞ্জিত হবে, কিন্তু হঠাৎ যে ১০ই মে হবে স্বপ্নেও ভাবি নি। বড় বাড়ি বিপদ ডেকে আনে তাই এক দরিদ্র হিন্দুস্থানীর বাড়ি রাস্তার ওপারে আশ্রয় নিলাম। চাকর বাকর, কুপ্পিভরা ঘি, চাঁদৌসীর গম, পিলিভিটের চাল পড়ে রইল।"

দানাপুর প্রবন্ধে যে আনন্দ রায়ের কথা বলেছিলাম তিনি দানাপুরের অন্য ব্যক্তি। এ আনন্দ রায় আমার মাতার মাতামহ। আমি যখন তাঁর মুখে মিউটিনির গল্প শুনি তখন তাঁর তিন মাথা এক হয়ে গেছে,—এত বুড়ো। বেঁচে থাকলে আজ বয়স হ'ত ১৭০ বছর। বার বার তাঁর গল্প বলাবলি করে বেশ মনে আছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী মিউটিনির কেতাবে ঠাসা। যেটা দেখি বোধ হয় যেন কলকাতার লোক চিবিয়ে চিবিয়ে গিলেছে। বাঁধাই

ভালই রাখা হয়েছে, পাতা ময়লা এবং পাঠকের থাম্ব ইম্প্রেশনও আছে। আমার সেইজন্য অভিপ্রায় নয় যে ট্র্যানস্লেশন বা উদ্ধৃত অংশ পরিবেশন করি। যা শুনেছি খাপছাড়া হলেও তাই বলি। "ইম্পিরিয়ালের" কেতাব ছাড়া বাঙ্গলায় 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' আছে, সকলেই পড়েছেন, আর গল্পচ্ছলে লেখা দুষ্প্রাপ্য 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' অতি মুখরোচক আত্মবিস্মরণকারী কেতাবের জন্য এখনও পাঠক লালায়িত।

মীরাটে বিউগ্‌ল-আহ্বান কোন জাতীয় যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সঞ্চারণ করেছিল?—সম্মুখ সমর না অনিষ্টকারীর অনিষ্টসাধন?—"মারি অরি পারি যে প্রকারে"।

বিউগ্‌ল ধ্বনি ছয় মাস মাউনটেড পাঠান ক্যাম্পে শুনেছি মহুয়া-বাগ প্রান্তরে। ঠিক তাদের পিছনে বাস করতাম। বিদ্রোহের জন্য ইওরোপীয় কমানড্যাণ্ট সর্বদা প্রস্তুত। মহুয়াবাগকে মীরাট ভাবতেন। দক্ষিণে চার হাজার নন-কো-অপারেটর (যাঁরা এখন হোমরাচোমরা হয়েছেন) ফুলওয়ারি কয়েদ-খানায় বন্দী। আমার সামনে কলকাতার মতন সাইরেন বেজে উঠত। তৎক্ষণাৎ অতি উত্তেজক বিউগ্‌ল বাজত, "তুঁয়া—তুঁয়া—তুঁয়া!"

"ভোঁ-পোঁ-পোঁ" নয়। আর্মি বিউগ্‌ল (army bugle), চার পয়সা দামের রথযাত্রার ছেলেদের তালপাতার ভেঁপু নয়।

বাজনা মনকে দৃঢ় রাখে, রক্তপাতের পূর্বে বা পরে পাছে বৈরাগ্য আসে তাই বিউগ্‌ল রণবাদ্য। বলিদানে বাদ্যের আবশ্যক, তাই ডাকাতরা ঢাক ঢোল বাজিয়ে আসত। বাজনায় রক্তপাত পবিত্র বোধ হয়। রেজিমেণ্টাল ব্যাণ্ড অতি ভক্তির জিনিস।

কলকাতা সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের জমাদার ভগবান সিং কলঃ মস্‌গ্রাট্‌ উইলিয়ামের কাছে ১৮ রকম বিউগ্‌ল ধ্বনি শিখেছিল। "তুঁয়া—তুঁয়া—তুঁয়া" মানে "এস সৈনিক, রক্তপাত কর!" সে বলত। বাজাবার তারতম্য বা আফ্‌সানোর আবেগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংকেত বোঝায় বিউগ্‌ল গর্জনের।

এঁর পিতামহ—নাম মনে পড়ে না—মীরাটে ১০ই মে রবিবার ইংরেজ "গারিজনের" মধ্যে বিউগ্‌লার পদে বাস করেছিলেন,—মিউটিনিয়ারদের দলে নয়। এঁর মতে ইংরাজ সৈন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সাহেবরা ঘেবড়ে গিয়েছিল, "তুঁয়া—তুঁয়া—তুঁয়া" পাল্টা হেঁকে যে ডাকবে 'আইজ ফ্রণ্ট!' সে ক্ষমতাও হল না। ইংরাজ বলেন, "এটা মিলিটারী রিভোল্ট মাত্র। আমরা জিততে বাধ্য; দেশের সমস্ত লোক সেপাইদের দিকে ছিল না। মোগল রাজ্যে তখনও ঘৃণা ছিল। শিখ পাঠান আমাদের দিকে এল।" কিন্তু শিক্ষা মীরাট থেকে আরম্ভ করে শেষ অবধি এমন হয়েছিল যে আজ পর্যন্ত লোকে সেই শিক্ষককে বাৎসরিক শ্রদ্ধা জানায়।

আনন্দ রায় বলতেন, মীরাটে সাহেবদের প্রভুভক্ত কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে আক্রমক সিপাইদের ভয় দেখালে। তার পর মনিব, তার পত্নী ও সন্তানের রক্ত দুঃখের সঙ্গে চাটতে লাগল। কোন কোন কুকুর গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল ও বাবালোগদের তোবড়ানো হ্যাট, বল, পুতুল ও নানারকম খেলনা পায়ে করে টানতে লাগল ও মৃত বাবাদের পায়ে করে নেড়ে "ঘুম" ভাঙাতে লাগল। মেমের ক্রন্দন অপেক্ষা কুকুরের আর্তনাদ বেশি শোনা গেল। "গ্যারিজন" সাহেবদের সেপাইরা আগেই সাবড়ে এসেছিল।

সিভিল লাইনে শোণিতাক্ত দেহে সাহেবরা ধপাধপ ভূলুণ্ঠিত হলেন। নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সের সব চেয়ে বিরাট মিলিটারী স্টেশন তখন মীরাটে। দিল্লীও তখন এই প্রভিন্সে।

মীরাট "মনোহরা পুরী", মে মাসে সকালে সন্ধ্যায় "বাহার মশিম" বা বসন্তকাল, যদিও দুপুরে লু চলে। আম গাছে কোকিল ডাকে ও "বুলবুল্লা ছোড়ে রং!" রাস্তার দুধারে ঝংকার নৃত্যরত ময়ূরের পুচ্ছের মতন। বৃক্ষশ্রেণী মহুয়ার সৌরভ ছড়ায়, ছায়ায় শহরের শোভা বৃদ্ধি করে। সে সময় লোকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার। বিস্তর মেম সাহেব। রাস্তার একদিকে তাদের লতায়িত ডালে, পুষ্পবৃক্ষে, 'পটউয়া' সবুজ ঘাসে সুসজ্জিত 'বাঙ্গলা' অপরদিকে বেয়ারা বাউরচি, ভিস্তি, ধোবির বাস।

ভগবান সিং-এর পিতামহ বলেছিলেন, মীরাট শহরে ১২ ঘণ্টা মাত্র সাহেব কাটা হয়েছিল। বন্দুকের গর্জন নেই, সেই টোটা পিচ্‌ট ব্যাটুলের জন্যে পুঁজি আছে। তরোয়ালে খচাখচ কাজ সাবাড় হল। তারপর রাত্রে নিদ্রা দেবী চম্পট দিলেন। সেপাইরা ফের "তুঁয়া, তুঁয়া" বাজিয়ে এক প্রকাণ্ড বাহিনী সৃষ্টি করলে এবং "হেপ্‌—হেই" হেঁকে ইনফ্যানট্রি, ক্যাভেলরী, আরটিলারী, ডবল কুইক স্টেপে দিল্লীর দিকে মার্চ করলো। দিল্লী মীরাট থেকে মোটে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। সুন্দর পাকা রাস্তা আর্টিলারীর ধারালো চাকায় ভাঙ্গা ইটের ভীষণ দন্ত বিকাশ করে হাসতে লাগল।

দানাপুরের কাহিনী লিখে যে কয়টা পোষ্টকার্ড পেয়েছি, কলকাতা, ইউ, পি, ও বিহার হতে, বোধ হচ্ছে ৯৬ বৎসর পরেও বাঙ্গালীর যা-তা আবল-তাবল মিউটিনির গন্ধে দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে এবং

আজও রবিবার ১০ই মে ১৯৫৩ বাঙ্গালীর উপর মিউটিনি তার ষন্নবতিতম জন্ম-বার্ষিকের প্রতিভা বিস্তার করছে এবং প্রত্যেক রক্তপাত কাহিনী শ্রবণ-মনোহর। ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা এই বিদ্রোহ, তাই সাহেব কাটা গল্প উত্তেজক। কিন্তু যদি সেপাইরা লড়াই ফতে করত তাহলে কি হত? পশ্চিমের একটি বাঙ্গালীরও মুণ্ড কাঁধে থাকত না। দানাপুরের ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে একটা বাঙ্গালী পাড়ার নাম 'গর্দানী বাগ' হল কেন? সেদিন কি বাঙ্গালীর মুণ্ড গর্দানের উপর ছিল না? মিউটিনিটাই কি প্রাদেশিকতার পূর্ব সূচনা? বেশ কথা, যদি মিউটিনিটা বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিস না হয়, নেতাজীকে কাড়ে কে?

নেতাজী নাকি বলতেন যে 'অ্যালারমিং ড্রম' অপেক্ষা বিউগ্‌ল ডাক বেশি উত্তেজক। একথা তাঁর এক অবাঙ্গালী কর্ণেল আমাকে পাটনায় মহুয়াবাগ গ্রামে বলেছিলেন। তিনি একজন মস্ত সার্জন। "হায়দরাবাদ কনটিন্‌জেণ্টের" বিউগলার ছটু খাঁ পাটনায় বলেছিলেন, জাপানী বিউগ্‌ল্‌ ধ্বনি সব চেয়ে "তেজ গরজে।" বিউগলের উদ্গীত উদ্গার বৃদ্ধ বাঙ্গালীকেও উদ্‌গ্রীব করে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ঢুলতে ঢুলতে বোধ হয় আমি অসাধারণ যুদ্ধকুশল বীর। ব্যাগ-পাইপের **pibroch** ধ্বনি মার্চ করবার সময় বিউগলের মত উত্তেজিত করে, যেমন ওয়াটারলুর পথে—**How in the noon of night the pibroch thrills,"**

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক W. T. Webb (১৮৯০) লখনউ অবরোধ শেষ হয়ে আসবার সময় **pibroch** ধ্বনি বন্দীদের কি রকম আশ্বাস দিয়েছিল কবিতায় বলেছিলেন।

বৃদ্ধ কালিদাস ঘোষ মুখে হাত লাগিয়ে চমৎকার বিউগ্‌ল বাজাতেন। তাঁকে একজন বলেছিল, "আপনার এত সুর তাল কি করে মনে আছে দাদু?" তিনি তাকিয়া ছেড়ে লাফিয়ে বললেন, "ওরে যুদ্ধে যে আমার মহা উৎসাহ!"

জানাশুনা লোক 'ভ্রম' সংশোধন করে লিখেছেন ঐ দাদু কালিদাস 'বসু' হবে 'ঘোষ' নয়। উত্তর: আমার পিতামহ নদীয়ার কালিদাস বসু শাস্ত্র নিয়ে থাকতেন, মিউটিনির ধার ধারতেন না। আমরা মিউটিনি রোগাক্রান্ত হয়েছি এই "সরকারী দাদু" কালিদাস ঘোষের ও মামার বাড়ির হাওয়া লেগে বর্ধমানে। কালিদাস ঘোষকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, "দাদু আপনি কখনো ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধের জন্য চড়েছেন?" তিনি বললেন, "আরে ঘোড়া তো কোন্ ছার; স্বপনে একবার নেপোলিয়নের কাঁধে চড়ে হাটে মাছ কিনতে গিছলামু।" ছটু খাঁ বলে, "কিরিন উঠনে রোজ বিউগ্‌ল শুনে তো বুড়াপ্‌পা আদমী কো জোয়ানী আ যায়!" এত জ্ঞান থাকতেও মীরাটে সাহেব গ্যারিজন বিউগ্‌ল বাজায় নি।

দিল্লীর দিকে মার্চ করবার আগে সেপাইরা তাদের রেজিমেণ্টের কয়েদীদের খালাস করে দিল এবং দল পুরু করল। মীরাট যখন আগে বিদ্রোহ করেছে, তখন সেখানকার সেপাইরা ভাবল, তাদের ডিউটি অন্যকে সাহায্য করা। তাদের চটপট খবর দেওয়া আবশ্যক। দিল্লী রওনা হওয়ার অন্য কারণ সেখানে বৃহৎ ম্যাগাজিন ও স্টোর দখল করা।

এক রাত্রে চল্লিশ মাইল মার্চ করা আশ্চর্য নয়। ঘোড়ার 'ডাক' (৩ মাইল অন্তর) বদ্‌লে, ঘোড়ার পর ঘোড়া রাস্তায় রুক্ষে গেলেও

জঙ্গ বাহাদুর নানা সাহেব ইত্যাদির মতন বীর সোমবারে আছেন দিল্লী, বুধবারে অশ্বপৃষ্ঠে এসে পৌঁছলেন ৩৮৬ মাইল এলাহাবাদে—আজ জঙ্গ বাহাদুর পাটনায়, কাল জঙ্গ বাহাদুর এলাহাবাদে ২৩০ মাইল। চায়ের জন্য মন ছোঁক ছোঁক করলে কি আর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়া হয়?

দিল্লীতে মীরাটের সিপাইরা পরদিন ১১মে সোমবার পৌঁছে গেল। তখনও সেখানে সাহেবদের কাটা হয় নি দেখে তারা তরোয়ালে ঘি মাখিয়ে কাজ আরম্ভ করলে ও দিল্লীর সেপাইদের দৃষ্টান্ত দেখালে। অনেকে সাহেব জঙ্গলের দিকে পালাল। সেপাই বলত, "এক তরোয়াল এক ছটাক ঘি পিতা হায়।"

মীরাটের কতক বাঙ্গলা আগুন ধরিয়ে ১০ তারিখে পোড়ানো হয়েছিল। দিল্লীতেও তাই হল। ম্যাগাজিন দখল করতে সেপাইরা অনেক চেষ্টা করল। যে কয়জন ইংরেজ এই ম্যাগাজিন রক্ষা করছিল, তারা আর সামলাতে না পেরে ম্যাগাজিন দুম করে উড়িয়ে দিলে। মীরাটের নাম এত বিখ্যাত কেন? লখনউ কানপুর দিল্লীকে প্রথম শিক্ষা দিয়েছিল বলে। পশ্চিমে হাওয়ায় ম্যাগাজিন বিস্ফোরণের ধোঁয়া দিল্লীকে ২৪ ঘণ্টা অন্ধকার করে আস্তে আস্তে উপে গেল।

এখন একবার এলাহাবাদ নেমে আসুন। এখানে আকবরের কেল্লার মধ্যে যে সামরিক বিভব আছে তা দেখে দিল্লীতে কি বিরাট আর্সেনাল ছিল বোঝা যাবে। ৬০ বৎসর পূর্বে বিপুল আর্সেনাল এলাহাবাদে দেখেছিলাম। ইংরেজ সোলজার সব জিনিস বোকা বাঙ্গালীকে বুঝিয়ে দিলে। শান্তির দিনেও রাশি রাশি তরোয়াল পালিশ হচ্ছে, সাজানো হচ্ছে। রাইফেল অগণতি, টোটার অফুরন্ত

ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার মিউটিনির সময়ে ছিল এখানে। তা রক্ষা করবার জন্য জঙ্গ বাহাদুর গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে নেপালী সৈন্য নিয়ে এলাহাবাদে ঢুকলেন।

জঙ্গ বাহাদুর গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডে যেখানে এক রাত্রি ছিলেন সে রাস্তার অংশটার নাম হয়ে গেছে "বাহাদুরগঞ্জ"। ই, আই আর, এর তলা দিয়ে এই প্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রাস্তা এলাহাবাদ শহর ভেদ করে গেছে। কোম্পানীর 'বুলক ট্রেনে'র ১০ হাজার বয়েলে এই রাস্তা 'জাম' হয়েছিল। জঙ্গ বাহাদুর তাই হঠাৎ পাটনা ফিরলেন ঘুরপথ দিয়ে কার্য শেষ না করে—কেন?

বলতে পারেন ইতিহাস পালন করছি না। সেপাইরা কি ইতিহাস পড়ে সেই অনুযায়ী লড়েছিল? বাঘ কি শিকারের কেতাব পড়ে সেই নিয়ম অনুযায়ী মানুষ মারে? দানাপুর তো ইতিহাস-ম্যাপে মিউটিনি এরিয়ার ভেতরে-ই নেই! এই তো আপনার ইতিহাস।

ঐতিহাসিক যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরাও মিউটিনি দেখেন নি আমিও দেখিনি। মিউটিনি থেকে পলাতকা জগন্মোহিনী দত্তর নাতি, মীরাটের আনন্দ রায়ের মেয়ের মেয়ের ছেলে, যা শুনেছি তাই লিখছি। আমি নানা সাহেবকে জঙ্গ বাহাদুরকে দেখি নি বটে, এখনকার ইতিহাসবেত্তারাও কোন্ দেখেছেন? জঙ্গ বাহাদুরের বংশধর একজন ছিলেন, তাঁর কথা বলছি। তাঁকে দেখেছি পাকা সাহেব।

ইংরেজ বলেন, ঝান্সী রানী কাটা পড়েছিলেন। আমেরিকান ইতিহাস বলেন, আউধ বেগম, ঝান্সী রানী; নানা সাহেব টেরাইয়ে পালিয়েছিলেন। এই তো আপনার ইতিহাস। এখন্ যদি বলি

ঝান্সী রানী মরেন নি, তিনি নেতাজীর ঝান্সী রেজিমেণ্টের স্মৃতিতে চিরজীবিতা তা হলে সেটা কি মিছে কথা হবে? ইতিহাস হবে না?

বাহাদুরাগঞ্জের নুরমহম্মদ পেণ্টার, মকদুম মোদির বাড়ির পেন্টিং থেকে জঙ্গ বাহাদুরের চমৎকার তস্‌বীর 'খিঁচে' এনেছিল 'বিলকুল মোছ মুণ্ডা, থোড়িসি নাক'।

এলাহাবাদের বাদসাহী মণ্ডির আর্টিস্ট আশিক আলী কানপুরের পীক দারোগার প্রাচীন বাড়ির পেন্টিং থেকে নানা সাহেবের এক চমকপ্রদ তস্‌বীর 'খিঁচে' এনেছিল 'ডবল মোছা, চুগ্‌গি ডাড়ি'।

কর্নঃ রণজঙ্গ রানা বাহাদুর পশ্চিমের এক শহরে বলতেন যে জঙ্গ বাহাদুরের নামে অনেক আজগুবি তস্‌বীর এবং গল্প যুদ্ধের সময় রচিত হয়েছিল। আমি রানা সাহেবের কাছে প্রায়ই মিউটিনি শুনতাম। তাঁর ইওরোপীয়ান স্ত্রী সরে যেতেন; বোধ হয় সাহেবের নিন্দা শুনতে হয় পাছে। যুদ্ধের আজগুবী গল্প বলবার শুনবার আনন্দ আছে। রামায়ণও বলেন, তপ্তসূর্যকে হনুমান বগলদাবা করেছিলেন লংকা যুদ্ধে। কুম্ভকর্ণের তস্‌বীরও চমৎকার।

এলাহাবাদের বৃদ্ধেরা আমাকে বলেছিলেন, জঙ্গ বাহাদুর বীর ছিলেন বটে; কিন্তু নানা সাহেবের মতন অত বেপরোয়া ছিলেন না। কার ভয়ে, কেন উল্টা রাস্তা ধরে পাটনা ফিরলেন এই গোপনীয় তথ্য এলাহাবাদে ছেলেদের গানে শুনতাম:

জঙ্গ বাহাদুর হোঁয়ে গায়েব
রেল সড়ক কি নিচে।
উ কোন্ আওয়ে—নানা সাহেব
উন্‌কো পিছে পিছে!

টেলিগ্রাফ ও ডাক যখন বিগড়ে গেল তখন খবর যেত ক্যামেল সোয়ার দ্বারা। অনেক শহরে পশ্চিমে এখনও ক্যামেল সোয়ার আছে। কুঁজের সামনে দু দিকে দুটো ঢাক বাঁধা থাকে।

লর্ড ক্যানিং হতভম্ব হয়ে বসে আছেন। নীল ও হ্যাভলক এই রকম সোয়ার দ্বারা খবর পেয়ে কানপুর দৌড়েছিলেন। এসপ্লানেডে যেখানে ট্রাম দাঁড়ায় সেখানে উট থাকত। কলকাতায় উট ভাড়া পাওয়া যেত। সেডান চেয়ারও পাল্কীর মত ভাড়া মিলত। মুসলমান উট চালক খদ্দের ডাকত, "বাবু, খানা বদোশ" অর্থাৎ বাড়ি বদলাবে তো এস আমি উটের পিঠে মাল বয়ে নিয়ে যাব।

মিউটিনি-দর্শীদের আবার মাঝে মাঝে সাক্ষাৎকার হত। ১৮৯৪ সালে মোরাদপুর পাটনায় এরকম এক রি-ইউনিয়ন দেখেছিলাম। বৃদ্ধা জগন্মোহিনী দত্ত এবং লোকপ্রসিদ্ধ বলদেব পালিত দুজনে ৩৭ বৎসর পরে মিউটিনির গল্প ঝালিয়ে নিলেন। ইনি জগন্মোহিনীকে বোধ হয় 'জ্যাঠাই' বলতেন। ভাল মনে পড়ে না। 'কর্ণার্জুন কাব্যের জন্য পালিত মহাশয় প্রসিদ্ধ। এঁর জীবনচরিত এক ম্যাগাজিনে লিখেছেন শ্রদ্ধেয় রায় সাহেব পি সি বসু (দানাপুর)। মিউটিনি শহরগুলোর তোপে-উড়ানো দেওয়াল, সাইনবোর্ড, রেসিডেন্সি, মীরাটের রাস্তা দেখে এলেই আনন্দ পাবেন আনন্দ রায়ের মতন। লর্ড কার্জন ট্যাবলেট বসিয়ে গিয়েছিল "ক্যাপ্ট অমুক'স ব্যাটারী" "সেপায়'স লাইন অপ রিট্রিট" ইত্যাদি। গোলাগুলি, শেকলবাঁধা ক্যানন বল, ভাঙ্গা বন্দুক সব সাজানো আছে। রেসিডেন্সিটা যেন একটা বিশাল ইতিহাস লখনউকে আঁকড়ে আছে।

ছোকরার মিলিটারী টেস্ট ছিল বেশ। মিউটিনির স্থানগুলো

চমৎকার বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। আনন্দ রায় মীরাট থেকে এসে এই রকম নানান মিলিটারী কথা বলতেন। বামুনপাড়ায় "পুবদুয়ারী" ঘরের বারন্দায় বসে "বুড়ো ঠাকুরদা" (দাদু শব্দ তখন বর্ধমানে চালু হয়নি) আমার মুখে দুধ রুটি দিতেন এবং আমার কানে ঢালতেন হ্যাভলক, লরেনস্, নীল, ক্যাম্পবেল, উটরাম, নিকলস, হাডসন, মীরাট ইত্যাদি। পাড়া প্রতিবেশী সব টিকিওয়ালা গোঁড়া হিন্দু। তাঁরা বলতেন, "ছি ছি রাধাগোবিন্দ, রায় মশায় এই বয়সে হরিনাম করবেন না এ সব ট্যাঁস ফিরিঙ্গিদের নাম উচ্চারণ করে পাপ করছেন, আর ছেলেটারও মাথা খেয়ে দিচ্ছেন। যা তুই গতি বামুনের বাড়ি লেখা-পড়া করতে যা। ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার।"

বুড়ো ঠাকুরদা বললেন, "আর একটা গল্প শোন্; আমরা যদি মীরাটে সেপাইয়ের দলে যেতুম ও সাহেব কাটতুম তো বাঙ্গালীদের গাছে গাছে ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে চাল চুলো পরিত্যাগ করে ভবঘুরের মতন বেড়াতে হত না। সেপাই চলে যাওয়ার পর সাতদিন মীরাটে ছিলাম। মড়া পচারু গন্ধে পালালাম। এত শকুনী গীদ চিল হাড়গিলে মীরাটে এল যে আকাশ অন্ধকার, যেন "আঁধি" উঠেছে। ছটা হাড়গিলে একটা সাহেবের মড়াকে এক ঘণ্টায় গেলে। সাহেবের নাড়ি এত লম্বা জানতাম না। রাস্তার এপার থেকে ও পার, শকুনী নাড়ী ধরে টানছে। ঐ নাড়ীর টানেতেই ওরা এই দূরদেশ মীরাটে এসেছিল।

"মীরাটের মতন শহর কি পৃথিবীতে আছে, না মীরাটের মতন কোথাও ১০ই মে বিউগ্‌ল বাজে?"

স্মৃতিপটে কুম্ভ

বেণীঘাটে যেমন দল-বল নিয়ে পৌঁছলাম, অদূরে গুরুগম্ভীর প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র শুনতে পেলাম—

হর হর গঙ্গা পার্বতী
পাপ না রহে এক রতি।

মহাপাতকে নিমগ্ন কোন ব্যক্তিকে বেণীঘাটের ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুযায়ী ডুব দিয়ে ধৌত করা হচ্ছে। এ দৃশ্য তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগের যোগ্য, যে দেখে তারও পাপ চলে যায়। পণ্ডিতের চীৎকার আসছে— "বুড়কি মারো! বুড়কি মারো!" [ডুব দাও! ডুব দাও!] এ ছাড়া দলবদ্ধ পাপ-নাশক-স্নান অহোরাত্র চলছে। বিশেষ দিনে নেহানও আছে।

পুরাণোক্ত সুধাপূর্ণ কুণ্ডা বা কুম্ভ এখানে ছিল, এক চুমুক খেলেই পাপ হ'তে মুক্তি তাই পরমধাম লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ পাপী-পাপিনী বেণীঘাটে ছোটে, কুম্ভের অমৃত পান করতে।

প্রবাদ, অমৃতি এই কুণ্ডার অমৃত থেকে কুণ্ডলী রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তাই পশ্চিমা বিধবাদের একাদশীর দিন অমৃতি খেলে পুণ্য হয়, পাপ হয় না। বাংলা দেশে এটা চলা উচিত। যুক্তিপূর্ণ প্রথা। বড় বড় অমৃতির দোকান থেকে চিৎকার আসছে, "গি কে মাল! গি কে মাল!—তাজে তাজে গরমা গরম।" জিলিপিরও উৎপত্তি ঐ একখানির অমৃত থেকে।

"কুঁজো"ও অনেক রকম বিক্রি হচ্ছে, ঘয়লা, ঘড়া, কলসী, জালা। চার কোণ যুক্ত কুম্ভ বিক্রি হত,—মাদ্রাজের এক সহরে নির্মিত [কুম্ভাকোনম্]। রাধিকার কোলে উঠে কুম্ভ পবিত্র হয়ে গেছে, "ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে। তাঁর অধরসুধা ও নয়নজল "অমৃতে হৈ" হিন্দীতে বলে। "দেহি মুখ কমল মধু পান।" কৃষ্ণ বলতেন। নোন্‌তাঁর চেয়ে মিষ্টিটা বেশী পছন্দ করতেন।

তাঁমা, লোহা, রূপা; মাটির কলসী সকলই পবিত্র; বালতি চালু হবার আগে কুম্ভই প্রচলিত ছিল। জলপূর্ণ কুম্ভ শুভ যাত্রা জ্ঞাত করায়, শূন্যকুম্ভ যদি ভরতে যায় তা আবার পূর্ণকুম্ভর চেয়েও শুভ যাত্রার বেশী পরিচায়ক। পশ্চিমে রাজারা যখন উপাধি লাভ করে দেশে ফিরতেন ৫০ জন মেথরানী মাথায় ভরা কুম্ভ নিয়ে গান গাইত।

ঘট বোলে কলা কল
পানিয়া দল মল।

এই অমৃতভরা কুম্ভের সঙ্গে সুমিষ্ট ফলের তুলনা করা হয়,—উড়িষ্যার বিখ্যাত পেঁপেকে "অমৃত ভাঁণ্ড" বলে। পশ্চিমে বড় জাতের কুম্ভকে "কুঁজো" বলে। মুঙ্গেরের "মোটকী" বিখ্যাত ছিল।

কলসী বা কুম্ভ অমৃতের আধার বলে এটা ভাঙ্গা মহাপাপ। অন্ধ ভিখারী কলসী বাজিয়ে গান করে খায়। তবে কখন কলসী ভাঙ্গতে পারেন,—যখন ভবলীলা শেষ, আর অমৃতের আবশ্যক নেই তখন। মড়া পোঁড়াবার পর কলসীতে জল এনে চিতা নিভানো হলে পেছু দিকে না তাকিয়ে ফটাস করে ভেঙ্গে কলসী ফেলে আত্মীয়রা বাড়ি যান। ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়ে গেল। এখন কুম্ভ, কুম্ভমেলায় হরিনামের কোন আবশ্যক নেই, বাকি রইল গয়ায় পিণ্ডি চট্‌কানো।

কিন্তু সঙ্গমে একবার অস্থি ফেলতে আসতে পারেন, মলেও নিস্তার নেই, ত্রিবেণী টানছে। ত্রিবেণীতে বিক্রয়ের জন্য কলসী স্তূপ ও কুম্ভমেলা তাই এত মহান্ দৃশ্য। এখন কলসী বিক্রি আর হয় না, নানা রকম খেলনা, লখনউয়ের তৈরি মাটির সাধু, ঠাকুর ইত্যাদি বিক্রি হয়, আর কাপড়-চোপড়। বড় বড় বেঢপ আকারের পেতলের কুম্ভ করে ত্রিবেণীর জল "নেহানের" দিন ঠেলা গাড়ি করে শহরে বিক্রি হয়। যারা কুম্ভে যেতে অপারগ, তারা ঘরে চান করে।

ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা, তাতে নানান দেব-দেবীর মূর্তি, তাঁদের সামনে চাল, লাড্ডু, ফলফুলরাশি ও রজত মুদ্রার সম্ভার। খনাখন রুপয়া গিরতা! আপনার দক্ষিণা তাতে নিপতিত হলেই গদাধরের পাদপদ্ম আশীর্বাদ পাবেন, ও পুরোহিতের অর্ধচন্দ্র, কারণ তরঙ্গ প্রপীড়নে নৌকায় উল্টি (বমি) হতে পারে ও পুলিস আপনাকে ক্যাম্প হাসপাতালে পাঠাবে। কলেরা রেজিস্টারে নাম উঠবে। ১০ দিন কোয়ারেনটিনে বন্দি হবেন যদি ডাক্তার কুঁচকি টিপে বলে, "পিলেগ হৈ!"

গত কুম্ভ, অর্ধ কুম্ভ, মাঘ মেলার স্মৃতিচিহ্ন আধ-ভোলা মনকে বহু বৎসর পরে জাগিয়ে তুলছে।

কুম্ভমেলায় বিশেষ আনন্দ পেতাম বলে আবার সে চিত্রের অবতারণা করতে ইচ্ছা করছে।

লক্ষ লক্ষ পাপী-দেহ ধৌত ত্রিবেণী জল, মেলার কোলাহল, মেঘশূন্য নীল আকাশ, জোছনার মত নরম রোদ, শীতের কনকনে হাওয়া মন যেন অদূরেই উপলব্ধি করছে।

বহু বৎসর এলাহাবাদে বাস করেছি। বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুম্ভমেলায় ঘুরে বেড়াতাম। ভ্যাগাবণ্ডা তীর্থযাত্রীর চেয়ে কুম্ভে

বেশী আনন্দ পায়। আমাদের ঘুরে বেড়ানো ছাড়া চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ছাড়া, তামাশা দেখা ছাড়া কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দৈবাৎ কোনও দিন নৌকাযোগে ঠিক সঙ্গমে পৌঁছে একটা ডুব দিয়েই মাছধরা পাখীর মত নৌকায় উঠে পড়তাম! অত ঠাণ্ডা জল কি সব বাঙ্গালীরা সহ্য করতে পারে?

যে জুনে জল কমলে এখানে রাত্রে ইংলিশ বোটে দল বেঁধে রো করতাম। হেথায় কোন বোধাতীত মোহ আছে। কালিদাসও মেঘদূতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম উপমান করে দুইকেই নদী-প্রধানা কবে গেছেন।

কলকাতা থেকে দুই যুবা পুরুষ "ওআন অপ" থেকে নামলেন। ষ্টেশনে তামাশা দেখছিলাম। শীতে কাঁপছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "মশায় রোজ কি এখানে এই রকম শীত?" বললাম, "রাত্রে আরো বেশী।" তাঁরা বললেন, "করব কি? সহ্য হচ্ছে না। গাড়ি কখন?" বললাম, "ঐ ডাউন মেল এল, যান ফিরে—পুণ্য ঠিক হয়েছে।" কষ্ট করলেই কেষ্ট।

শুধু যে বেণীঘাটে মেলা হচ্ছে তা নয়। সমস্ত শহরটাই কুম্ভ-মেলা হয়ে পড়েছে। ভাঙ্গা বাড়ি পর্যন্ত ভাড়া হয়ে গেছে, বাঙালী জানালায় উঁকি মারছেন। অত বড় কপির দেশ, বাজারে একটি কপি নেই, বার লক্ষ পঙ্গপাল চাটপোট করে দিয়েছে।

কপালকুণ্ডলাতে আছে "তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেইরূপ হইতে পারে।" অনেক বৃদ্ধা কল্পবাস করতে এসে ছেলেদের ধ্যান শুনে গৃহস্থের বাড়ীতেই থেকে যান:—

মাঘে প্রয়াগে বুড়ী কল্পবাসে
মরণ নিশ্চয় পশ্চিম বাতাসে।

আধুনিক বিলাতী ভূগোল-বিশারদ পণ্ডিতরা সরস্বতী নদীর গঙ্গা যমুনার সঙ্গে মিলনের কথায় বড় একটা কান দেন না। রয়াল জেওগরফিক্যাল সোসাইটির উপাধিকারী এক মহাবিদ্বান্ বন্ধু বলেন সরস্বতীর বিদ্যমানতার কোন চিহ্ন নেই। নাইনী রেল স্টেশন তা হলে কি অন্তঃসলিলা? এইখান থেকে সরস্বতী ছুটে সঙ্গমে পড়েছিল?

সরস্বতীর অস্তিত্ব না মানলেও আমরা যমুনা ব্রিজের মাঝামাঝি প্যারাপেট থেকে তিনটা বেণী দেখি। গঙ্গা এখানে বেঁকেছেন, এই বাঁকস্থলে যমুনা মিলেছে। গঙ্গার দুটো লাইন ও সোজা যমুনার একটা রেখা তিনটা বেণী গড়ে তুলেছে। এখানে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি। প্যারাপেটে দাঁড়িয়ে সঙ্গমের কাল-হলদে জলের রেখাকে জিজ্ঞাসা করুন হিন্দীতে:— "সরস্বতী নাহিনা?" আবার আওয়াজ প্রত্যাবর্তন করে হিন্দীতে পাঁচ বার উত্তর দেবে "নাহিনা—নাহিনা—নাহিনা—নাহিনা—নাহিনা! এই শব্দেই নাকি "নাইনী" স্টেশনের নামকরণ হয়েছিল। রামচন্দ্রের সময় থেকে গঙ্গাও এর "অপ এ" গতিবিধি বদলেছেন। পুরাণে যে ঘাট ও-পারে ছিল এখন এ-পারে, অথচ নিজের স্থানেতেই আছে। গঙ্গা মায়ী "ইধার সে উধার বহ গাওয়া।"

কলকাতায় এক বিখ্যাত পুরাণ-লেখকের কাছে বসে একদিন কুম্ভমেলার গল্প করতে করতে বললাম, "সুরজকুণ্ড পুলে রেল গাড়ির ভীড় দেখছি—" তিনি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, "কি বললে? সুরজকুণ্ড! কোথা এই সুরজকুণ্ড খুঁজে খুঁজে আমি হায়রান! এলাহাবাদের ও-পারে?" বললাম, "না, এখন এলাহাবাদের মধ্যে,— হয়তো একদিন ও-দিকে ছিল। মানিকতলা বাজারও বোধ হয় গঙ্গার

ওপারে ছিল ভূমিকম্পে গঙ্গার চাল-চলনের সঙ্গে আমার সুবিধার জন্ত এদিকে এসেছে!" গঙ্গার মাহাত্ম্য!

ত্রিবেণী ঘাট না বলে লোকে বেণীঘাট বলে কেন? তিনের উপর কিছু সন্দেহ আছে বোধ হয়। আর না হয়তো সুরজকুণ্ডের মতন এটা একটা পৃথক শহর ছিল, এখন ত্রিবেণী বেণী এক হয়ে গেছে। অথবা একটি 'বেণীর' পাশে ঘাট বলে। আসল সঙ্গম একটু দূরে।

এই বেণী নামের উপর লোকের এত ভক্তি যে এলাহাবাদের বহু লোকের নাম বেণী বাবু। গিন্নিদেরও নাম বেণী রানী, বেণী দাসী। এক "মুক্ত ভোজে" আড়াশ শ বাঙ্গালী শহরে খেতে বসেছেন। একজন দৌড়ে বলল, "বেণী বাবুকে ডেরা মে আগ লাগে হায়!" অমনি অর্ধেক লোক ভোজ ছেড়ে বাড়ি ছুটলেন। সকলেই বেণী বাবু, কার বাড়িতে বিপদ কে জানে!

স্বামী বিদেশ থেকে যখন পত্নী বেণী রানীকে চিঠি লেখেন ডাকিয়া [পোস্টম্যান] এই নামের চিঠি অন্ত গিন্নির হাতে দিয়ে যায়। খুলে পড়েন গিন্নী, "আমার বুকের ধন!" লজ্জিত হয়ে বলেন, ওরে নেপলা, পাড়ার সব বাড়ির বেণী রানীদের দেখিয়ে দিয়ে আয় ঠিক বুকের ধন কে।

খোট্টাদের ভেতরও অনেক রকম বেণী আছে,—বেণীয়া, বেণী পরসাদ, বেণী দাস, বেণী মাহতো, বেণীরাম,—"সব বেণীয়ে বেণী হৈ।" তারা বলে। "বেণী মাধো" নামে ঠাকুর ও জায়গাও আছে।

পাপের বোঝা এখন বেড়েছে, তাই চার গুণ লোক কুম্ভে বেড়েছে। সকলেই যে চান করে পাপ ধোবে তার মানে নেই; নাকাখোর, ঘুষখোর, গাঁটকাটা, গদ্দিদার [হোর্ডার], ব্ল্যাক-বাজারী, পলিটিশিয়নরা ডুবকি দিয়ে পাপমুক্ত হবেন। পূর্বে তীর্থে পলিটিক্স ছিল না।

একমাত্র ত্রিবেণীর পানিই পাপের বুকে ছুরি বসাত। "আব লিচন্ত হোগা!" [লেকচরের হিন্দী]। অর্ধেক যাত্রী ভিখারী,—অন্ধ, পঙ্গু, বস্ত্রহীন। সমুদ্রতরঙ্গের মতন পেছু-পেছু ছোটে। তাই লোকে থলে ভরে আধ পয়সা নিয়ে যেত, তাই ছড়াত। এত বেশী পঙ্গুর দল যে এক পয়সা দিতে হলে দাতা নিজেই ভিখারী হয়ে পড়বেন। অথচ দান না করলে পাপ ও মনের ব্যাধি ঘোচে না।

কুম্ভে যিনি দান করেন তিনি মহাপাপী—ঘোর পাপে যন্ত্রণার উপশম করতে চান খরচ করে—

যব শির লাগে ফাটনে
খয়রাত লাগে বাঁটনে।

তীর্থযাত্রী খরচ করতে যেমন ব্যগ্র, কুম্ভে অবৈধ রোজগার তেমনি উন্মত্ত। একটা ছেলে বললে, "দেখবেন?" পেনসিল দিয়ে বেলে মাটি খুঁড়তে লাগল। কতকগুলা খোট্টা জিজ্ঞাসা করল, চিজ ঢুঁড়ত হ্যায় বাঙ্গালী বাবু?" ছেলেটা বললে, " খোয়া গিয়া!" খোট্টারা খুঁজতে আরম্ভ করলে; হাজার হাজার লোক মাটি খুঁড়তে লাগল, "গিন্নি হৈ! গিনি তখন চালু ছিল।

অন্যান্য ঘাটেও যথেষ্ট লোক-সমাগম, ভরদ্বাজ ঘাট, রাম বালুয়া ঘাট, গৌ-ঘাট, ইত্যাদি। তিনটা রেল-স্টেশনেও সমান ভীড়, —এলাহাবাদ জংসন, এলাহাবাদ সিটি, প্রয়াগ। ঘোড়ার গাড়ি, উটের গাড়ি, হাতী, পালকি, ডুলি, একা ধূলো উড়িয়ে অন্ধকারে "ট্রাফিক জাম" প্রস্তুত করে চপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ফোর্ট ব্রেক পাথ করবে "জাম" ভাঙবে।

কুম্ভ রহস্যারম্ভ পুলিস-আফিসকে ব্যস্ত করে তোলে। তখন থেকেই রেজিস্টারের সব রকম 'কলম'-ই 'এনটি' প্রাপ্ত হচ্ছে :—পাকিট-মার, গালিগুফতা, দাগাবাজী, খুন, বহুচোরী, লেড়কি চোরী, সুইসাইড, রুপয়া লুট, জিনাহারাম, ইত্যাদি। লোকে পাপ ধুতে যায় কি পাপ করতে যায় সমস্যা সমাধান শক্ত। মেলার আগেই লোক জমে।

একটি ঝুলনী (নোলক)-পরা বাঁকা (রূপসী) মেয়ে বলছে, "মেরি হাঁসুলী, ছড়া কড়া, গহনা গুড়িয়া সব ছিনলিয়া বাবু :—গঙ্গাজী মে জান দে দুঙ্গি।"

"লস্ট প্রপার্টি" আফিসে গহনার কি টাল লেগেছে! কুম্ভ প্রারম্ভ গহনা দান দেখেন, বাঙ্গালীর বউ গহনা হারাতে পটু। [গড়াতেও কোন্ কম ?] অন্তর্জ্ঞানীয় ইচ্ছা—সোনা [পূরীষের প্রতীক] ফেলে দিয়ে পাপ হতে উদ্ধার হই। একটি মেয়ের হারানো কানের ফুল খুঁজতে গিয়েছিলাম। এক হাজার কানের ফুল প্রারম্ভতেই জমে গেছে,—যেন জুয়েলারী শপ। ফিরে এলাম, পুরুষ নারীকেই চিনতে অপারগ, তার কানের ফুলজোড়া মিলিয়েও চিনতে পারলাম না,— সে আমাকে জোড়াটা দিয়েছিল।

কে এই গহনা কুড়িয়ে অফিসে জমা দেয়? সে চুরি করে না কেন? তা হলে ধর্মপরায়ণ লোকেরও পৈরাগে আগমন হয়! না কি সে পাপী পাপ মোচন করতে এসেছে, আর তার নূতন পাপ করবে না। ছেলেদের রূপার চুষিকাটি, যাকে পশ্চিমে জুজী বলে, কোমরবন্ধের সঙ্গে ফিতায় বাঁধা থাকে। ছেলে আঙুল চুষলেই মা বদ অভ্যাস ঘুচাবার জন্য ছেলেকে জুজী কাটি চুষতে দেন। হারানো জুজী পর্যন্ত আফিসে জমা হয়।

ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত। শরীরকে বৃথা কষ্ট দিলে যদি পাপ যায়, তবে আমাদের এই বৃহৎ "ভ্যাগা পার্টির" যথেষ্ট পুণ্য হয়েছিল, কল্পবাসীদের চেয়েও আমরা ১ মাসে বেশী রোগা হয়েছিলাম। চায়ের হোটেল নেই, ফ্ল্যাস্ক ২টাতে কুলায় না। খাঁটি দুধের দোকান আছে, গরম গরম দেয় 'পরই' করে,—অর্থাৎ ভাঁড়ে। কোষ্ঠকাঠিন্য না থাকলে খেতে সাহস হয় না। যেন জোলাপ। "হাম্‌দি সে" "কালু" "গামা" পহলওয়ানদের ফটো দুধের দোকানে টাঙ্গানো আছে। এই রকম গায়ে জোর থাকলে এই দুধ হজম হয়; "নেহি তো পৈতলুন খারাপ যায়ী" [বেগ সংবরণে অক্ষম]।

অনেক লোক রাত্রেও চান করে। একবার কনকনে শীতে বেণীঘাটে রাত্রে "ডাক মহারাজ"কে ঝাঁপ দিতে দেখলাম। গঙ্গাভক্ত বৃদ্ধ নারীবয়ান দেখতেন না; বলতেন, "সড়ক কি আওরত না দেখনা চাহি, রক্ত মে আতেহেঁ, ইসকি কিমত মান্‌নে কি হমারি আদত পড় গয়ি হৈ। ঐসি হৈ পুরুষত কি মহিমা।" পুরুষের মনের বিকৃতি নিবারণ জন্য তাহলে নারীর রাস্তা পরিত্যাগ বিধেয়।

"ডাক মহারাজ" নাম হ'ল কারণ লণ্ঠন হাতে হাঁকডাক ছাড়তে ছাড়তে আসতেন :—

হলা কল্ কলা
হলুয়ে কে লিয়ে কুম্ভ মেলা।

গঙ্গা-ভক্তিতে উন্মাদ হয়ে তার পর লণ্ঠন সমেত ঝাঁপ দিতেন। ইনি বলতেন, লোকে হলুয়া জেলেবী খেতে আসে কুম্ভে, পুণ্য করতে নয়। [হলা কল্ কলা=ও লো কল্লোলিনী!]

আগ্রা কানপুর জব্বলপুর লখনউ থেকে গাঁজার ছিলিম চালান আসত। সেকালে ভারতে ৫২ লক্ষ সাধু ছিল। ৪, ৫ লাখ কুম্ভে আসত, ফেরত যেত, আবার আসত "মেলা" স্পেশালে চলে যেত। নিরঞ্জনী আখড়ায় সাধু সব অনাবৃত। ছাই কেবলমাত্র অঙ্গভূষণ। সেদিকে স্ত্রীলোকদের যেতে বারণ। ঝুসিতে অনেক গুহাবাসী সাধু থাকে। তারা চটের থলের মধ্যে প্যাক হয়ে ঠেলা গাড়িতে আসত। মেলাভূমিতে গুহা নেই বলে চটসুদ্ধ মাটিতে পড়ে থাকত। চটের থলে গুহার কাজ করে। চেলা এসে মাঝে মাঝে দুধ ও গাঁজা খাওয়াত। মেয়েদের আলাদা স্থান। সন্ন্যাসিনীদের মাতাজী বলত। পুরুষকে সেদিকে যেতে দিত না। এখনকার দিন হলে ভাবতাম তাঁদের রুপ কুপন নেই তাই।

বাঙ্গালীর বউ যে পুলিসের পাস নিয়ে নিরঞ্জনী আখড়ায় গিয়ে বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করেন ও মন্ত্র বলেন "প্রজনঃ সর্ব্বভূতানাম্ উপস্থ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে" [আত্মা পরমাত্মার মধ্যে উপস্থ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছে] এ গল্প এলাহাবাদে শুনতাম। প্রমাণ পাই নাই। অকস্‌ফোর্ডও (মহাভারতের মতন) বলেন "ফ্যালস্ [উপস্থ] জন্মদাতা বলে পূজিত হ'ন।" তা তো সকলের জানা। কথা হচ্ছে মাঘে প্রয়াগে এ পূজা হয় কি না?

খুব বড় বড় খাবারের দোকান। এত সুন্দর জিলাপি, মতিচুর, কচৌরি, পুরি, বরফী, কালাকন্দ, গুলাপজামুন, 'খজুর,' ঘিওড়া, রাবড়ি, মালাই, ছহি যে, শহরে বাঙ্গালীবাড়ি হাঁড়ি চড়া বন্ধ। ভীড়ে সমস্ত দোকান দুর্ভেদ্য, এঁটো বটপাতায় ঠোঙ্গা নিবিড় ভাবে পড়ে আছে। সে দেশে শাল পাতা নেই। মেয়ে-পুরুষ ক্ষুধার পীড়নে গরম তরকারী

ও কচৌরি বুঁদিয়া চিবুচ্ছেন, একসঙ্গে রেঞ্চে বসে। পরমাসুন্দরী ভোজনলোলুপা হিন্দুস্থানী রমণী গালে এত বড় গরাস ঠুসেছেন যে শ্যামাঙ্গী বাঙ্গালী মেয়েরা হিংসায় চিবুতে চিবুতে বলাবলি করছে, "বদন ব্যাদান দেখছো পুঁটি মাসি?"

হালুয়াইর হাউলাররা চেঁচাচ্ছে, "জেলেবী! জেলেবী! জেলেবী কে বাপ জেলেবো! ঘি কে মাল! ঘি কে মাল!"

চার রকম রাবড়ি,—লচ্ছে-লচ্ছা, দানাদার, ঢোঁড-ঢোকা, পুটুর-পুটুর। ব্যাখ্যার স্থানাভাব।

এক মালসায় চার রকম দই একসঙ্গে পাতা। কি একটা পাতা দিয়ে কমপার্টমেণ্ট করা আছে! খাট্টা, মিঠা, ফিকা, নোনগর।

আর সাধারণ দই টক বটে, কিন্তু কি চাপ! হাতের আঙুল থেকে ঘি ছাড়ে না। মতিচুর দিয়ে চটকে খান। কি স্বাদ! তিন আনা সের সেকালে, কোথাও কোথাও দু'আনা। জিলাপী ।৵, কচৌরি পয়সায় দুটো। আটা টাকায় সাড়ে বার সের, ঘি ২ সের, দাল টাকায় ২৬ সের। গোল্ডস্মিথ কবি বলেন :—

স্মৃতি! তুমি প্রবঞ্চক
কি রঙ্গে মাতিয়া
মরমে বেদনা দাও
অতীতে ডাকিয়া!

আবার একরকম দই আছে গ্রামে যা চেঙ্গারিতে পাতা হয়। আর একটা "ডাগরা" ময়দা দিয়ে এঁটে ঢেকে দেওয়া হয়। সবটা দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে পুকুরের পাঁকে পোঁতা হয়। ৮ দিন পরে বের করে খান যেন একটা প্রকাণ্ড চীজ-কেক। মানুষকে ভগবান

খেতেই জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু কুম্ভ মেলার লক্ষ লক্ষ ভিখারীর কোন গতি করেন না। দেখে জীবন ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়।

"হর হর গঙ্গা!" প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। সকলে দেখলাম পাপীটা, দিব্যি সুন্দর পুরুষ, আগে ভেবেছিলাম নানান ব্যাধিতে রুগ্ন পাপী বিকট দেখতে হবে রাক্ষসের মতন।

"আওর এক বুড়কি (ডুব) মারো! এক রুপয়া আওর নিকালো।" ট্যাঁক থেকে পাপী টাকা দিল।

"হর হর গঙ্গা পার্বতী, পাপ না রহে এক রতি!" পণ্ডিত হুঙ্কার ছাড়লেন, "কেয়া পাপ কিয়া সবোন কো সামনে বোলো।" লজ্জার কথা।

পাপী বললে, "আম চোরি, জামুন চোরি, চাচীকে খেত সে ধান চোরি, আওর আওরত দেখা সড়ক কি; আওর ঝাঁকি ঝাঁকা—"

"হর হর গঙ্গা! বুড়কি মারো, পাঁচ পাপকে পাঁচেই রুপয়া দেও, বেশী নাই মাংতা।"

পাপী টাকা দিয়ে চলে যেতে উদ্যত। পণ্ডিত বললেন "কুছ ছিপায়া ত নেহি? সব পাপ বোলো।"

"হাঁ পণ্ডিৎ জি!" বলে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে ফিরে বললে, "পণ্ডিৎ। এক পাপ কি খিয়াল উতার গিয়া।"

"বোলো, বোলো!"

"হাম কলকাত্তাকে হামেদিয়া হোটল মে সিককাবাব ভোজন কিয়া!"

"এ পরমাত্মা! এ সচ্চিদানন্দ! ই পাপীকো নরক মে ভি স্থান [illegible] দেও!" পণ্ডিৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

পাপী ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল, "পণ্ডিৎ, জি বুড়কি মারে ফিন্ ?"

পণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন, "কেতনা সিককাবাব খায়া থা ?"

"ছ হি ইঞ্চি (মাত্র ৬ ইঞ্চি।)"

"এ সচ্চিদানন্দ ! ই পাপী কো আপ কেয়া হাল করেঙ্গে। হা কপার ! হা কপার !" বলে পণ্ডিত কপাল চাপড়াতে লাগলেন। যেন নিজেই পাপী। এতে পাপী সত্যই ভয় খেয়ে গেল, কারণ, বেণীঘাট থেকে নরক স্পষ্ট দেখা যায়। হামেদিয়া হোটেল থেকে নয়।

পণ্ডিত বললেন, "ছ হি রুপয়া দেও। বুড়কি মারো ! আওর এক বুড়কি,—ছ বুড়কি মারো।"

পাপী বললে, "পানি বড়ি ঠাণ্ডি হৈ !" শীতে কাঁপছে।

"পাপ ভি তো গরমা গরম থা না ? হর হর গঙ্গা পার্বতী, পাপ না রহে এক রতি !"

পাপী এবার যাবে ; ট্যাঁকের সব খরচ হল, এক রতি এক ছিলাও পাপ মনে রইল না, পূর্ব শান্তির স্মৃতি প্রাণে ফিরে এল।

বলতে বলতে চলল, "আওর পাপ নেই করেঙ্গে। সড়ক মে কৈ ঝুলনীওয়ালী বাঁকা ছুকুরিয়া দেখেঙ্গে তো শূয়ার কি বাচ্চী কো হালাল কর দুংগা।'

১৩৬০

আম শাস্ত্র

পশ্চিমে আমবাগানের মাথাটা ফেব্রুয়ারিতেই সাদা হয়েছে। "সব পেড় মুজরা বাবুজী, কয় হাজার ল্যাংড়া আপকো মে-ই মে ভেঁজে?" লম্বাচওড়া কথার মালিক 'রাখোয়াকে' খুশী রাখা ভাল, বললাম, "জিতে রহো বেটা, পিছে কহেঙ্গে।"

ডানহাতে লাঠি বাঁহাতে ছাতা, বেশ শীত, ভোরবেলা বেড়াচ্ছি। বহুদূরবিস্তৃত ঘনশ্যাম বৃক্ষশ্রেণী স্নেহময়ী মায়ের মতন দুধ বর্ষণ করছেন,—ছাতার ওপর টপ টপ শব্দ, আর মুকুলের মন মাতানো সৌরভ। মে মাসের শেষেও যখন ল্যাংড়া বেশ ডিমের সাইজ হয়েছে, শিলের মতন মাঝে মাঝে জোরে পড়ে; ছাতা না থাকলে মাথা ফুটো হবে।

মুকুল শুরু থেকে ঘ্রাণে আমভোগ! মাঝে ভূরিভোজন,—শেষে অক্টোবরে 'রাঢ়ী ভাদইয়া'—উপরটা কালো ভূত। একটি আগন্তুক খেয়ে তাঁর বাড়ি গিয়ে বলেছিলেন,—'কামড় দিলে বলবো কি ভাই দুধের বাটিতে যেন কে খুনখারাপি গুলে দিলে, একটা কালো মোষ বলিদানের দৃশ্য, একটা হালালের পরব!'

হাঁ! রাঢ়ী একটু কালো ও টক বটে। আম রসগোল্লা নয়, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের আমওয়ালা প্রিয়নাথ বলে, "একটু আনারসী হবেই থাকে রাঢ়ী, সুকুল, সিন্ধিয়া, সফেদা, আলফানজো, নীলমভারী হিমসাগর, পেয়ারাফুলি, মধুগুলগুলি যা-ই খান না কেন। একটু টক না হলে খাদ্য হজম হয় না।"

সেই জন্য পশ্চিমারা কাঁচা আম রোজ চিবিয়ে খায়; টক দই মেখে পাকা আম খায়। আর গায়ে জোর আর ভুঁড়ি তদনুপযুক্ত। আর বাঙ্গালী? কাঁচামিঠে আম না হলে চিবিয়ে খেতে চান না।

তবে পাকা আম খেতে বাঙ্গালী মজবুত বটে। ভোজবাড়ি কমপিটিশনে ২৫টা বোম্বাই বা ২০টা ল্যাংড়া খেতে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এক একটা কৃপণ ধনবান গৃহস্বামী এত খরচ করতে রাজী নন। আমরা একবার ছেলেবেলায় দলবেঁধে খেতে গিয়ে দেখলাম একটা ঘরে ল্যাংড়া বেশ বড বড় সাজানো আছে, বোঁটা কাটা ধোয়া।

কিন্তু যখন আম এল দেখা গেল বাজে বীজ আম ছেলে-ছোকরার ব্যাচে পরিবেশন হবে। আমরা ঐকতানে হাঁকলাম "ও আমি নয়! ও খাব না। রাজা, বাদশা, বড বড জজ, জমিদার বাবুদের জন্য যে আম ও-ঘরে সাজানো আছে, সেই ল্যাংড়া খাবো কুড়িটা করে।" অগত্যা গৃহস্বামী অপ্রতিভ হয়ে তাই হুকুম দিলেন।

. পাকা দেখায় কখনও ছাড়ানো আম খাবেন না, ফিকে হয়েছে বা ঝাঁজ হয়েছে, নাশপাতি রাঙ্গা হয়েছে। পুজার প্রসাদেও এই হাল। আম উঠতে না উঠতে ওলাউঠো ওঠে।

আম ছাড়ানো হতে না হতে মুখে ফেলবেন। বঁটিটা বউদিদিরা যেন আগে বেশ করে ধুয়ে নেন। আম কেটে আর ধোবেন না, স্বাদ চলে যায়। আগে বোঁটাটি কেটে ফেলে বেশ করে রগড়ে আঠা বের করে বরফ-জলে খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রাখবেন। দু পয়সার বরফে আমার দুচারটে গোলাপখাস কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

পেটুকের নানান দোষ। দুধভাত পাকা আম দিয়ে খেতে খেতে আবার গোটা আমের আচার বা আচারি (খোলা ছাড়ানো টাকনা

দিলে হজম ভাল হয়। গরম লুচি দুধে ডুবিয়ে তাতে কিষণভোগের শাঁস বা 'মাংসল' মালদহের দেহটা ছেড়ে দেবেন। বামুন হন, কায়েত হন আপনার তখন অত্যন্ত চিত্তপ্রসাদ জন্মাবে। বলবেন, 'আমরাজ্য কি মজা!"

কোনও কোনও খোট্টা বড়মানুষ আমে লোহা ছোঁয়ায় না। বাঁশের চেঁচাড়িতে আম ছাড়ান, বা দাঁতে। আসল আমভক্ত দুধভাত আমে কদাচ চিনি বা সন্দেশ খান না।

ভাল আম বলে যাতে শুঁয়ো বা ছিবড়ে নেই, যাতে চাকা কাটলে মাঝখানটাতে থলথলে থাকে না, সমস্ত চাকাটা সমান 'মাংসল' হবে, আঁটি হবে বেরালের জিভের মতন পাতলা ও ছোট, খোলাও হবে এত পাতলা যে, আঙুলে টেনে ছিঁড়লে শুধু ছালটাই বেরিয়ে আসবে একটু রস নিয়ে, কিন্তু আমের ভক্ষ্য অংশ আঁটিতে লেগে থাকবে। 'সুকুলের' কথা আলাদা, এই আম রসের জন্যই বিখ্যাত।

ইনডিয়ায় এসে খাঁটি সাহেব কখনও আম খায় না। শুধু জলও খায় না। দৈবাৎ মেমসাহেব গুসলখানায় ঢুকে পোশাক পরিত্যাগ করে আম চোষেন। আঁটি চুষতে চুষতে যে শব্দ হয় তা এটিকেট বিরুদ্ধ। কৃষ্ণনগরের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একবার ব্রাহ্মণ-ভোজন দেখে বিলেতে মেমকে পত্র দিয়েছিলেন,—

"মাই ডারলিং! দুইশত হাফ নেকেড পনডিটস ক্ষীরের সঙ্গে বোম্বাই আম ও লুচি চট্‌কে 'গ্রাণ্ড সাকিং সাউণ্ড' করলো। চক্ চক্ চক্ ওরা শব্দর নাম নিজেই বলে। আঁটি চোষা যদি বিলোতে কুড়ি শিলিং টিকিট করে দেখানো হয় তো সেনসেসন হয়। ডিনারে এক ঘণ্টা বসে দশটা আঙুল ও ছুরি কাঁটা চামচ ১৩টা যন্ত্র দিয়ে আমরা যা অতিকষ্টে

শেষ করি ব্রাহ্মিনরা মাত্র পাঁচটা আঙ্গুলে ১০ মিনিটে ফিনিশ করে। হাপরাবার সময় ডান হাতের চারটে আঙ্গুল মাউথ ক্যাভিটিতে হাপুস্ শব্দে প্রবেশ করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে। তারপর থম্ব চোষার কি ধুম মাই ডিয়ার!"

চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, হাপরান সব কটা আকাঙ্ক্ষা আমে মেটে। আমে পেট ভরে, 'স্টেপল ফুড' বলতে পারেন চার মাসের জন্য। 'আরও খাদ্য জন্মাও' বলছেন, কিন্তু এই যে খাদ্য আম যা জন্মেছে, তাকে মানুষের পেটে যেতে দেওয়া হয় না কেন? কলকাতার সব স্টলে আম পচছে! দামের 'ক্লিকে' মানুষ খেতে পায় না। মানিকতলা বাজারে একটা রুপার গয়না পরা কালো মোটা মেয়েমানুষ চার হাজার আম নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, ইস্-সে কম নেই বেচেগা। তার কি দাপট! আম পচাচ্ছে। খদ্দেররা এই রূপসীকে 'রুপো বাঁধানো হুঁকো' বলে।

প'চে লোকসান বন্ধ করবার জন্য 'সরপ্লস' আম পাটনার 'গভর্নমেণ্ট এগরিকলচরাল ফারম্' যুদ্ধের আগে টিনে 'প্রিজার্ভ' করতো। আট আনা টিন খেয়েছি। অতি চমৎকার আঁটিকাটা ল্যাংড়া, বোম্বাই এবং দীঘা-ঘাটের বিখ্যাত আম। এ কারবারটি শুনচি এখন লালবাতি জ্বেলেছে।

বোম্বাই আম মিষ্টি বটে, কালো জাতের বা হলদে চামড়ার, কিন্তু ল্যাংড়ার মতন অতদিন টেকে না। বিলাতে ল্যাংড়াই চালান যেত এয়ার 'সার্ভিস' হবার আগে। বোঁটাতে গালা মোহর লাগানো হত এই ভেবে যে, এইখান দিয়ে হাওয়া বা পোকা ঢুকে আমে পচ ধরায়।

'Indian Gardening' বলে একটা চমৎকার ছবিওলা ম্যাগাজিন ছিল, তাতে C. Maris এবং P. C. Dey দুই আমশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আম সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করতেন। তাঁরা পঞ্চাশ বছর হল পরলোকে। আমশাস্ত্রে এখন আর কেউ গবেষণা করেন না, তার বদলে ঐ ধরণের নামে কি একটা শাস্ত্র চান্‌কে উঠেছে, সেইটেই চালু।

আমকে স্টেপল ফুড বলেছি তার কারণ বিবেকানন্দ রোডে দেখতে পাই। একা একটা লোক ফুটপাথের উপর কিনারায় শুয়ে বেঁহুশে ঘুমুচ্ছে, মাথার কাছে এত আমের খোলা ও সতেরোটা দেশী আমের 'প্রাণপণে চোষা' আঁটি। তার আর চব্বিশ ঘণ্টা কোন ভাত-তরকারির দরকার নেই।

বাদুড়বাগানের বৈকুণ্ঠবাসী মাসিক পত্রিকা 'বাঁশরী'র এডিটর এত আম ভালবাসেন যে, চারদিন কেবল ল্যাংড়া খেয়েছিলেন। পঞ্চম দিনে হঠাৎ পতন ও মূর্ছা। রিসিভার তুলে একজন ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, 'বি, জেড টু নাইন টু সেভেন!" তৎক্ষণাৎ মাছের ঝোল ভাত চটকে তাঁকে খাইয়ে দেওয়া হল, চাংগা হয়ে উঠলেন। 'আমবুলেন্স' ফেরত গেল। রবিনসন ক্রুসোও অতিরিক্ত আঙুর খেয়ে চৈতন্য হারিয়েছিল।

বাঙ্গালীর মতে মাছমাংস আমের বিশেষ প্রতিষেধক, আর ইউ. পি বাসীদের মতে 'দুধ হ্যায় আম-কি antidote'। এই ওলাউঠোর দিনে একা আমে রক্ষা নাই, আবার দুধক্ষীর দোসর কেন?

কলকাতায় এক পেটরোগা বাঙ্গালী রাজার দুধসাগুতে একটি খোলা-ছাড়ানো গোটা বোম্বাই আম ছেড়ে দেওয়া হত। ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট পরে আমটি তুলে ফেলা হত।

ভাগ্যিস রাজা হই নি, তাহলে রুপার বাটিতে চুমুক দিয়ে এই রাজভোগ খেতে হত।

কাঁচা আম পোড়ার শরবতকে সাহেবরা Mango Fool বলে। খেলে 'লু লাগা' সারে। সাহেবদের আবার কালা আদমীরা Mango Fool বলে; কারণ সাহেবরা আম খেতেও জানে না বানান করতেও জানে না। লেখে Mangoe Lane, বৃথা একটা 'e' খরচ হয়। বহুবচনে বটে 'o-e-s' হয়।

তামিল শব্দ 'ম্যান' মানে গাছ, 'কে' মানে ফল; Portugueseরা 'ম্যানকে' উচ্চারণ করতে পারতো না বলে 'Manga' বলত। ইংরেজরা তাও পারত না বলে Mango বলতে শুরু করলে। তপসে মাছের season আমের season এক। তাই বোধ হয় Mango Fish নাম হয়েছে। Mangosteen-এর আমের সঙ্গে সম্পর্ক মামার শালা পিসের ভাই। আর বিখ্যাত Mango trick একটি ঠকচাচার জুয়াচুরি মাত্র।

ইংরেজী ইতিহাস ও কবিতায় দৈবাৎ 'আমি' দেখতে পাই, ভাল ফল বলে নয়, যুদ্ধ বা প্রেমের কাহিনী বলতে বলতে লিখেছে :—

> The mango trees are riddled through
> The beasts of forest restive grew
> As muzzle-loaders went off bang !
>
> (Battle of Plassey)

ইংরেজ কবি তাঁর পরিত্যক্তা প্রণয়িনীকে সম্বোধন করে বলেছেন বিলাতে বসে—

Golu! In the far far East
where the mango and banana
Made us many a merry feast!"

(To My Forsaken Golu)

বেশীর ভাগ ইংরেজ-ই আমে তার্পিন গন্ধ বলে এই ফল পছন্দ করে না। বাঙ্গালীর ঢেঁকুরে এক মাদ্রাজী বেগমফুলি আমেই এই গন্ধ উপলব্ধি হয়।

অনেকের মতে যে আমে আমের গন্ধের বদলে বেলের বা কর্পূরের বা কাঁঠালের গন্ধ আছে সে আমই উপাদেয়।

বিহারের এক ফুট লম্বা 'কেরোয়া' আমে অক্টোবরের শেষে কলার গন্ধ থাকে ও কাঁঠালের মতন মাড়ি। দুধভাতের রং হয় যেন গৈরিক রঞ্জিত কাপড়। মে-জুনে বোম্বাই চটকে দুধভাত খাচ্ছি কি দুধে আলতা ঢেলে খাচ্ছি বলা ভার।

আর এলাহাবাদের 'বেনারসী ল্যাংড়া?' লখনউএর 'আমীন দাসেরী'? একটি স্নেহরসে মুখের ভেতর গলে, এটি আমের ছত্রপতি, বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি, আর একটি (আমিন) রসালকুল রাজ্ঞী,—রূপ উছলে পড়ছে এবং তার শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ জিভকে ঈষৎচঞ্চল করে, নিস্রাবে মুখ আর্দ্র হয়। আকৃতি হাঁসের ডিমের মতন, কেবল বড়।

আমভক্ত হনুমান এত রামভক্ত ছিলেন যে, ভাল আঁটিগুলা অযোধ্যায় ও সীতার বাপের বাড়ি মিথিলায় ছুঁড়েছিলেন লংকার

বাগানে গাছে বসে। রাগ করে দ্রাবিড় ওঁচা আঁটিগুলো ছুঁড়েছিলেন, তবে বারো মাস ফলে বটে।

আমের 'নাম ডাক' শুনে আমীর অভ কাবুল এক ওমরা পাঠালেন ভারতে। 'খেয়ে এসে বল আম কেমন ফল। ভাল লাগলে কাবুলের বাগানে আল ফলাব।'

ওমরা এক আঁশওয়ালা বুনো আম খেয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'সে রেশানা ডাগা খিয়াল।' [এ শুঁওবালা আম কি একটা খাত্ত] হিন্দিতেও শুঁওকে 'রেশা' বলে।]

রাজসভায় ফিরে এসে ওমরা বললেন, 'আম কেমন ফল জিজ্ঞাসা করছেন খেয়ে দেখুন!' একটা বদনায় তেঁতুল গুড় গুলে লম্বা দাড়িটা তাতে ডুবিয়ে বের করে নিলেন তারপর রস গড়ানো দাড়িটা ধরে হিজ হাইনেসের মুখের কাছে গিয়ে বললন,—'চুষ্-চুবুক—ভের বুমো!'—হুজুর আম চুষুন! দাড়ির মতন শুঁয়া, একটু মিষ্টি একটু টক!

মুরশিদাবাদের এক নবাবের আম খাবার শখ ছিল। বেশী পাকবে না, ডাঁশাও হবে না, ঘরে পাকানোও খাবেন না। নবাব চৌকিদার রেখেছেন পাহারায়। সে রাত দুটোর সময় মশালের আলোয় দেখলে একটি আম গাছ-পাকা হয়েছে, ছুটে এসে বলল, 'হুজুর, এক আম পাকা হায়।' তড়াক করে নবাব উঠে রুপার ছুরি হাতে নিয়ে বাগানে ছুটলেন। নিজহাতে কেটে খেয়ে ফিরে এসে আবার ঘুমোলেন।

আম তোতলামির ভাল ঔষধ। হিন্দুস্থানী তোতলা রামায়ণ পড়বার সময় যদি কেবল স্থর করে গায় 'রা-রা-রা-রা' তাকে উপদেশ

দেওয়া হয় "তুম ভেইয়া আম বোলো', সে তখন দিব্যি সরল সুর ধরে—

আম কহেন শুন্ লংকা ভাই
হুকুম হোয় ভিতর ঘুস্ যাই।

শ্রোতারা তখন বলে, 'আর তত্তুলুয়া মজেসে পাঠ কর্ রঁহে হেঁ।' বাঙ্গালী তোতলাও 'আম' বলতে কথা আটকায় না,—'আম বাবুর বাড়ি যাই', 'আমচন্দ্র ও-কথা মুখে আনতে নেই।' আমের রোগ সারানো গুণ আছে বই কি! আম যে ভগবান রাম। শুঁটকো লোককে মোটা করে।

আবার অনেক রোগের সঙ্গে যোগ করে আমকে কবিরাজ মশায়রা খেলো করে দিয়েছেন 'আমরক্ত', 'আমাশয়,' 'আমবাত', 'আমফোড়া', 'আমবুলান্স'।

উড়িষ্যায় 'অমবো' বলে, আমরা সভ্য হবার আগে গ্রামে 'আঁব' বলতাম, অম্বুবাচিকে সকলেই ভক্তিভাবে 'অম্ব্রবতী' বলে। 'আম নামের কি-ই বা মহিমে!' গানও শুনেছি।

'আম তরেসে বনি হ্যায়',—মানে খুব ভাল করে কাজটা করা হয়েছে। আম মানে পরম, আম মানে রাম স্বয়ং।

প্রয়াগের 'সট্টি'তে সের হিসাবে আম বিক্রি হ'ত। ওজন কররার সময় সুর করে গুলাবচাঁদ আমওয়ালা বলত,—

রামে রাম ভাই রামে রাম
দুয়ে আম ভাই দুয়ে আম!

তাই তাকে বললাম, 'এই তোম রামকে আম বোলতা কাহে?' সে বৃহল 'কেঁও? দোনো এক্‌কে হৈ!' 'বটে কথা! তাই আম

ডাল ভেঙে ভাঁড়ে বসিয়ে পূজা করি। শুভকর্মে তাই আমের পাতা টাঙ্গান হয় 'খচিত মুকুলে ফলে পল্লবের মালা ব্রতালয়ে!"

আবার কতকগুলো খেলো থাড়কেলাস শব্দ 'আমের' সঙ্গে যোগ হয়ে বেশ নাম করেছে,—আমরুল, আমাআদা, আমানি, আমসন্দেশ, আমলকী, আমড়া, সাদিআম (পেয়ারা), আমমোক্তার, দেওয়ান ই আম, আম-এ-রিকা।

এখন কথা হচ্ছে, যে মুলুক এই পবিত্র 'আম' নাম গ্রহণ করে তার পরহিংসা সাজে না, পরকে ধ্বংস করবার অস্ত্র তৈরি করলে সে অস্ত্র (নামের মহিমায়) তাকেই উড়িয়ে দেবে, **hoist with his own petard!** রামায়ণে ইহাই কহেন :—

রামচন্দ্রকে নাম যোন ধরে,—
দুর্গম কাজ হেরি জগৎ ডরে।
সংকটে তোড়ে উসিকে শিরা
খোদ রাম সহিত হনুমান বীরা
তুলসীদাস সদা হরি•চেরা
কীজে দাস হৃদয় সহ ডেরা।

১৩৬১

খাজা কাঁঠাল

"উনি একটি খাজা" রোজ শুনতে পাই; মানেও সকলে জানে, "নিরেট"।

এই পদবী কাঁঠালে লাগানো হয়। মানুষের নামে লাগালে বড়াঘরানার খেতাব বোঝায়। বড় লোকের পাড়া আছে পাটনা সিটিতে, তার নাম খাজা খালান। গায়ে কাঁটা আছে বলে কণ্টকীকে হিন্দীতে "কাঁটাহর" বলে।

বর্ধমানের খাজা থেকে "খাজা কাঁঠাল" হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে না। "নিরেট" অর্থাৎ রসপূর্ণ নয় বলেই খাজা কাঁঠাল নাম হয়েছে। অন্যটাকে "রসি কাঁঠাল" বলি, আর যে জাতের কোয়া উপরে নিরেট নীচের অর্ধেক রসে ভরা থলথল করছে, তাকে রসো-খাজা বলে।

সেকালে গ্রামে কাঁঠাল পাকলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না, শেয়ালগুলোও আনন্দে বিহ্বল। "আহা-আহা" শব্দে অনিমন্ত্রিত আগন্তুক দল এসেছে ও রবাহূত দল প্রায় আগত; ভোঁদড়, বাঁদর, হোঁদড়, হুড়ার। গন্ধগোকুল, বিমলানী, হুতুমথুমা হোঁদলকুঁতকুতে নিজেরা কাঁঠাল না খেলেও শেয়ালের কাঁঠাল চুরির চাতুর্য দেখতে এসেছে। বাগানে সারা রাত মহোৎসব।

আজকাল বন্ধু-বান্ধব এলে চা ও বিস্কুট। আম লীচু দিতে পারেন, কিন্তু কাঁঠাল খেতে দেওয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। এক শ বছর পূর্বে আমার বাবা যখন শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন বর্ধমানের নিকট এক গ্রামে,

তখন নতুন জামাইকে তাঁর শাশুড়ী একটা রূপার থালায় ঘরে-ভাজা গরম মুড়ি এবং বাগানের বড় বড় খাজা কাঁঠালের কোয়া খেতে দিয়েছিলেন। দিদিমা আমাকে বলেছিলেন, "তোর বাবা বাঁ হাতে ধরে এক মনে গীতা পড়ছে, আর ডান হাতে থাবা মেরে মুড়ি খাচ্ছে। সব কাঁঠাল ফুরিয়ে গেল; তোর বাবা থালার দিক না তাকিয়ে কাঁঠালের কোয়া খুঁজছে; হাতড়ে পাচ্ছে না; আমি তাড়াতাড়ি দশটা বীচি ছাড়ানো খাজা কোয়া চুপি চুপি থালে আবার ফেলে দিলাম। তোর বাবা সব খেয়ে ফেলল। আবার রাত্রে লুচি আর ক্ষীর ও এক জামবাটি রসি কাঁঠালের মাড়ি ও রুইমাছ।"

কলকাতার নতুন জামাইকে কেবল কাঁঠাল দিলে সে শাশুড়ীকে ঢিপ করে নমস্কার করে পালাবে। মুড়ি দিলে বলবে, "দূর্ বুড়ী!"

এ গ্রামে বর্ধমানের সীতাভোগ, খাজা মিহিদানার অভাব ছিল না, আমাদের তাতে অরুচি জন্মেছিল। এ পুরানো কাহিনী থেকে বোঝা যায় কাঁঠালের কত কদর ছিল। কেন সে যশ লোপ হল? আর গরম ঘরে-ভাজা মুড়ি ৭৫ বছর চোখে দেখি নি। যা করেন এখন 'বিষ-কুট', 'পাপ-রুটি'।

কাঁঠালের খাতির এত বেশী ছিল যে, একটা সর্দার ছেলে পাঠশালায় অন্য পোড়োদের জিজ্ঞাসা করত, "এই বল দেখি কি?

তেল চুক চুকে পাতা
ফলে ধরে কাঁটা
পাকলেই মধুর রস
গোটা গোটা বীচি।"

চারদিকে চিৎকার উঠত, "ক্যাটালটা ক্যাটালটা!

কাঁঠাল বীচির গুণও বহুবিধ। রোদে শুখিয়ে রাখা হ'ত। এখন বাজারে এই বহুগুণশালী 'মেওয়া' বারো আনা সের কিনতে হয়। অর্শ রোগের কঠোর কাঠিন্যে কাঁঠাল বীচি অব্যর্থ ঔষধ। অড়হর ডালে দিয়ে খাবেন। গ্রামে গান শুনেছি :—

ওরে রামশশী,
যখন পাকা কাঁঠাল খাবি,
বীচি গুলো রাখবি তুলে!

কাঁঠালপাড়ার বাড়ী সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠাল গাছকে তাচ্ছিল্য করে আম্রকানন নায়ক-নায়িকার মিলন স্থান করেছেন। কিন্তু কাঁঠাল গাছেও কোকিল ডাকে। দুষ্মন্ত শকুন্তলা তেঁতুলতলায় দেখা-শুনা করতেন। বিশ্বামিত্র মেনকার গাছের দরকারই হ'ত না। বিবেকানন্দ রোডে যে সব সুসজ্জিত ক্ষণিকের নায়ক-নায়িকারা বস্-স্ট্যাণ্ডে মিলিত হন তাঁদেরও গাছের আবরণ দরকার হয় না। সকলের সাক্ষাতেই দৃষ্টি বিনিময় চলে। আমাদের এ পাড়ায় চোখের পর্দা বহুকাল লোকান্তরিত।

ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসীর গানে কাঁঠালকে আমের সঙ্গে সমান সম্মান দেওয়া হয়েছে। খুকীর ঘুম এসেছে, মাসী থাবড়ে থাবড়ে গান গাচ্ছেন কি স্টাইলে খুকী শ্বশুর বাড়ী যাবে :—

আম-কাঁঠালের বাগান দেব
ছাঁওয়ায় ছাঁওয়ায় যেতে;
উড়কি ধানের মুড়কি দেব
পথে জল খেতে।

চার মিনসে কাহার দেব,
পাল্কি কাঁধে নিতে
দুই মাগী দাসী দেব
পায়ে তেল দিতে
……ইত্যাদি।

"মুড়ি-মুড়কি কাঁঠাল" পল্লী সুখের প্রতীক। রমেশ দত্তর এক সুন্দরী নায়িকার আঁচলে এক সখি মুড়ি-মুড়কি বেঁধে দিয়ে বললেন, 'জলযোগ করিও পথে',—সন্দেশ মোণ্ডা নয়। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় কাঁঠাল অতি লোভনীয় উপঢৌকন ব'লে সঙ্গে বাঁকে লাদাই হয়ে বিস্তর যেত। আবার কেউ কেউ কাঁঠালকে অযাত্রা বলেন। খুকীর ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ীর গানেও আছে:—

তারা গাই বলদে চষে,
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে,
কাঁঠাল, ক্ষীরের হাঁড়ি
ভারে ভারে 'এসে'!

নূতন জামাইয়ের প্রথম শ্বশুরবাড়ী এসে গীতা পাঠ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না, কারণ স্ত্রীর বয়স মোটে আট বছর। তাই প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা শালী থাকলে তাদের সঙ্গে ইয়ারকি মস্করার প্রথার উৎপত্তি। দীনবন্ধু লিখে গেছেন, "শালী বারো আনা—গ" (অর্থাৎ পত্নী)

বাংলার এক প্রখ্যাত বিপত্নীক কবি শালীকে বিয়ে করতে না পেয়ে এমন একটি হৃদয়-বিদারক কবিতা লিখে গেছেন যে মেয়ে-পুরুষ অর্ধ শতাব্দ ধরে সেটা আওড়াত। তার পর যখন নভেলে ও কবিতায়

পরকীয়া প্রেমের প্রাবল্য দেখা দিল তখন অনূঢ়া নাবালিকা শ্যালিকার প্রেম জাতিচ্যুত হল। বিলেতে আইন বদলাবার ধুম কি! শালীকে বিয়ে করবার জন্য সাহেবরা পাগল।

গ্রাম্য ভোজে কাঁঠালের কোয়া বীচি সমেত পরিবেশন করা হ'ত। একটা ফুলশয্যায় ত্রিশজন তত্ত্ব নিয়ে আসবার কথা ছিল। কিন্তু বর্ধমান থেকে আট মাইল দেড় শ ক্ষুধার্ত লোক মাথায় ধামা চুবড়ি নিয়ে এল। একটা ঘরে একঘর পাকা খাজা কাঁঠাল ছিল, সেই জন্য বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম। দুখানা লুচি ও ছিরিক করে একটু ডাল তরকারি দিয়ে দেদার কাঁঠাল পরিবেশন করা হ'ল। খিদের চোটে খুব কাঁঠাল সকলে খেল। পাছে তারা বর্ধমান গিয়ে নিন্দে করে বলে সুখ্যাতি কবুল করিয়ে নিলাম, 'কেমন খাওয়া হল,' সকলে বললে 'এমন ভোজ রাজবাড়ীতেও খাইনি।'

বিহারে কাঁঠাল বাংলার মতনই। প্রচুর জন্মায়। রসি কাঁঠাল খাবার আমাদের একটা আলাদা খেলো বাড়ী ছিল। কোয়া চিবিয়ে রস গিলে ছিবড়েটা দেওয়ালে ছুঁড়ে দিতাম; চটাস করে সেটা এঁটে যেত; ছ-মাসে দেওয়াল অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত হল। বামুন ঠাকুর কলাপাতা মাটিতে রেখে তাতে রসি কাঁঠাল কোয়ায় কোয়ায় জড়িয়ে দিয়ে দড়ির মতন লম্বা করত। তার পর এই দড়ির এক প্রান্ত মুখে নিয়ে টুলে দাঁড়াত। মুখ থেকে কলাপাতা প্রায় তখন ন ফুট। এই কাঁঠালের দড়ি সড়াৎ করে টেনে মুখে পুরতো। দু হাত কোমরে থাকত। চোয়ালের জোরে সব 'দড়িটা' মুখে চলে আসত। পনের মিনিট চিবিয়ে একটু সামান্য ছিবড়ে মাটিতে ফেলে বলতো "কাঁঠাল বাজী বলে একে, কাঁঠাল সবটাই রস—একটুখানি ছিবড়ে।"

রাজার বাজারের কাছে একটা কাবুলীদের মেস আছে। কুড়িটা কাবুলী কুড়িটা কাঁঠাল আধ ঘণ্টায় গেলে, ছিবড়ে ফেলে না। শেষে ভূতিগুলা হাতে নিয়ে কুড়িজন বীর ধপাস করে ডাস্টবিনে ফেলে। রান্নাবান্নার হাঙ্গামা নেই।

পশ্চিমে গ্রাম্য রামায়ণ পাঠ হয়, তাতে বোঝা যায় হনুমান কাঁঠাল ভালবাসেন :—

চট্ চট্ ভিঙত
মুচ্ছে ডাড়ি ছাতে,
প্রভু হনুমান যব
কাটাহর খাঁতে,
হর কিসিম কি খেল
বীরা দেখাতে
সড়প্ সড়প্ পিয়েঁ
পনস অমৃতে।

[মোছ, দাড়ি, ছাতি অর্থাৎ বুক বেয়ে রস গড়াচ্ছে। নানান রকম অঙ্গভঙ্গী করছেন যখন সপ্ সপ্ করে পনসের অমৃত পান করছেন।]

লক্ষ হাড্ডা (ভীমরুল) কাঁঠাল বিক্রেতার পেছু ছোটে। আমি একবার ফেরিবালার কাছে পাটনায় কোয়া কিনেছিলাম। একটা ভীমরুল হাতে কামড়াল। দশ মিনিটে গায়ে 'র‍্যাশ' বেরিয়ে গেল। কাঁঠাল খাবার বিপদ আছে বৈকি।

কাঁঠালে আবার জীবন রক্ষা হয়। ৫০টা কাঁঠাল এক খেয়া নৌকায় ছিল; আর ৫০টা মানুষ। মাঝ দরিয়ায় নৌকা ডুবলো, তখন সেই

কাঁঠাল বুকে দিয়ে সব লোকেরা ভাসতে ভাসতে ডাঙ্গায় পৌছায়।
কিন্তু সব কাঁঠাল ভাসে না।

আবার এক রকম মারাত্মক আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাঁঠাল আছে। ছ
বছর বয়সে গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে যে সুন্দরী কোটাল
ঝি কাঁধে করে বেড়াত সে কোথায়?"

মামি সম্পর্কে একজন উত্তর দিলেন, "আহা বাবা তার কথা আর
শুধিও নি, কাঁঠাল বাগানে তার ঘর ছিল. সে কাঁঠাল ফেটে মরেছে।
ঘরের মেটে জমিতে সে শুত। জমিটা একটু ফেঁপে উঠেছিল ও
কানে তার কলের গাড়ি চলার মতন গুড় গুড় শব্দ বাজতো। একদিন
দেখলাম মেজে ফুটি ফাটা, চারিদিকে কাঁঠাল বিচি, সুন্দরী মরে পড়ে
আছে। বীচিগুলা ছর্‌রার মত গাঁয়ে বিঁধেছে।"

কাঁঠালী চাঁপা, কাঁঠালী কলা, কাঁঠাল কাঠ, কাঁঠালী চুড়ি অনেক
জিনিষ কাঁঠাল থেকে নাম পেয়েছে।

কাঁঠাল থেকে অনেক গ্রামের নাম হয়েছে, কাঁঠালবাড়ী, কাঁঠালগড়,
কাঁঠালপাড়া (বঙ্কিমের জন্য বিখ্যাত); আর বোলচাল তৈরি হয়েছে
যেমন "গাছে কাঁঠাল গোফে তেল"।

একটা চল্লিশ সের কাঁঠাল চুরি করতে তিনটে শেয়ালের দরকার
হয়। কাঁঠালটা তিন জনে ঢু মেরে মাথায় jack up করে তোলে।
(শেয়ালকে Jackও বলে। জগতের বৃহত্তম ফল বলেও একে Jack
বলে। তিন কারণে নাম হয়েছে Jackfruit) তারপর একটা শেয়াল
পেঁছু হাঁটে ও দুটা শেয়াল সোজা হাঁটে। তিন মাথার ওপর কাঁঠাল
ঠিক বসে 'ডেসটিনেসনে' পৌছায়।

বানর বন্দন

লখনউয়ে গোমতীর উপর "মংকি ব্রিজ।" প্রচণ্ড শীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি দুপরবেলা, সঙ্গী সেদিন কেউ ছিল না। হাতে একটা ছড়িও নেই।

আমার বাঁদিকে বাঁদরের উপবন, সামনে বাদশাবাগ ও ক্যানিং কলেজ, ডাইনে শত শত জামগাছ। বর্ষাকালে এই সব উঁচু গাছে লোক বসে দড়িবাঁধা ঝুড়িতে বড় বড় মিষ্টি জাম দেয় নিচে নামিয়ে; একটিও থেঁতলায় না। সহরে হেঁকে বিক্রি করে "কালে কালে ভরোঁদে!" এক কুড়ি খেলেই পেট ভরে। যেন এক একটা চার আনা সাইজের রানাঘাটের পানতুয়া।

চারখানা ঘরের এক্কা এসে থামল। রূপার কারুকার্য করা চাকা। তা থেকে চারজন ব্রাহ্মণ চাপরাসী কতকগুলা ঝুড়ি নামালে, পুরি, মিঠাই, বেগুন, ছোট ছোট কলা, আর অসময়ের শশার মত কিছু ফল।

তারা জঙ্গলে ঢুকলো, একেই তো হিন্দিতে 'মওকা' বলে। আমিও ঢুকলাম। এমন 'মওকা' বা সুবিধা আর হবে না। যদি আঁচড়ে কামড়ে দেয় তাহলে রাজারাজড়ার এই সেপাইরা বাঁচাবে, কারণ তারা রোজ ফল দেয় ও বন্দনা ক'রে ব'লে বানর সব তাদের চেনে। তারা হাত জোড় করে গায়:—

"জয় জয় জয় হনুমান গোসাঁই
কৃপা করো গুরুদেব কি নাঁই
ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ
মহাবীর জব নাম শুনাবৈ।"

বাঁদরে বন গম গম করছে। এক একটা বানর পরিবার এক একটা গাছের প্রকাণ্ড তেফরকা গুঁড়িতে বসে আছে দল বেঁধে। কর্তাটিকে একটা গাছে বুড়ো দেখলাম। নিরামিষ-ভোজিনী গিন্নি তার স্বামীর পিঠ থেকে একটি একটি উকুন বেছে নিয়ে খাচ্ছেন। শহরের অটবী কি রম্য স্থান! চিৎকার হচ্ছে 'পবন তনয় সংকট হরণ', 'রাম লখন সীতা সহিত', যেন ঠিক এইমাত্র লঙ্কা জয় করে রাবণ বধ করে রামচন্দ্র ঘরে ফির লন।

একটা বড় বাঁদর ঠিক আমাদের গ্রামেব চরণ মামার মতন লোমশ। ডারউইন দাদার দেখা পেলে বলতাম, "দাদু, দেখ তো এই কি তোমার হারানিধি মিসিং লিঙ্ক্? তাহলে পূর্বপুরুষের পূজা করি, দুটা কলা দি, বন্দনা করি :—

জব বোলো তব রাখে রাম
দুস্‌রি বাত কি কিয়া কাম?
ভজ মন কপি ভজ মন রাম।
ইত্যাদি"

আর একটা গাছের গুঁড়ির তিন অবয়বযুক্ত ফর্কে আর এক কর্ত্তা আড় হয়ে শুয়ে আছেন, ছেলেপিলেরা তার পা টিপ্‌ছে। তালুক-দারদের সেপাইরা গাছের তলায় তলায় ফল ফেলে দিচ্ছে, বাঁদররা খেতে আরম্ভ করল। কেউই উঁচু ডালে বসে না, ভক্ত খাবার আনবে তাই। ঝাড়ু-বরদার ঝাঁট দিয়ে জমি তকতকে করে রেখেছে।

সদ্যস্নাতা বড়া ঘরানার মহিলারা ঘটির জল গর্তে গর্তে ঢেলে দিল। গুমটিতে চান করে জল ভরে আনা ধর্ম। জলের জন্য ছোট ছোট গর্ত কাটাই আছে।

বাঁদররা মুখ জুবড়ে জল পান করল। কলার খোলা ছাড়িয়ে কলা খেলে, বেগুনগুলো আধখাওয়া করে ফেলে দিল। রাজাদের দৌলতে এ অরণ্যে ক্ষুধার্ত বাঁদর নাই। ইউনিভারসিটি-প্রশ্ন ছিল একবার "রাইট অ্যান এসে অন দি লখনউ মংকি ব্রিজ।"

অযোধ্যা ও প্রয়াগে বাঁদরের এত আদর যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তার কদর জানে।

বিনা ক্লেশে ফলমূল মিষ্টান্ন পেয়ে বাঁদরগুলো কুঁড়ের বাদশা হয়ে গেছে! যখন জাম পাকে তাদের একটু কষ্ট করে রাস্তা পার হয়ে গাছে উঠার আগ্রহ দেখা যায় না। ঘুঁগঠ্ (ঘোমটা) খুলে নির্ভয়ে 'পরদা' মেয়েরা স্তুতি আওড়াচ্ছে :---

আশমান কে ঘেরে কারি বাদরিয়া
লঙ্কা কে ঘেরে হনুমান!
জৈ হনুমান জ্ঞান-গুণ-সাগর
জৈ কপীশ তিনহু লোক উজাগর।

বাঁদর কর্তাগিন্নির পাশে একটা বাচ্চার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটি গহনা গুড়িয়া পরা সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়া বাচ্চাটার পিঠ থাবড়ে ঘুম পাড়াতে লাগলেন 'শুতহ বাবুয়া! এ মেরা ভেইও, আব্বা লেটে হ্যায়, আম্মা লেটি হ্যাঁয়, শুতহ! এ বাবুনিও, মোটর সে দোঠো আনার তো লাও বাবুয়া কে লিয়ে।' মুক্তার মালা গলা থেকে খুলে দেন নেই এই ঢের। বাঁদরকে বেদানা কি আর এমন বাড়াবাড়ি? কলকাতায় যে বেড়ালের বিয়ে হয়েছিল লাখ টাকা খরচ করে। পয়সা থাকলে তালুইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ করে লোকে; পয়সা না থাকলে নিজের বাপেরও শ্রাদ্ধ হয় না।

নারীর দল বন্দনা করে একে একে চলে গেল। মাঝে মাঝে লোক আসছে ও বুড়ো বাঁদরদের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা ব্রাহ্মণ সেপাই বললে, 'পূজা করো বাবুজি। ই বাঁদর কাটাহা নেই হ্যায়।' তার পা ছুঁলাম, কপালে পা ঠেকালাম। আমার দিকে বুড়ো পিট পিট করে চাইছিল, ভাবছিল 'এতদিনে একটি বাঙ্গালী ভক্ত জুটলো।' যে বাঁদররা কামড়ায় তাদের 'কাটাহা' বলে, যে মানুষকে থাবড়া মারে তাকে 'মারখা বাঁদর' বলে।

উত্তর প্রদেশে জ্যান্ত বাঁদরকে বাঙ্গালী পূজা করে না এই আমার ধারণা, কিন্তু বাঁদরমূর্তি পূজা বাঙ্গালীর মধ্যে চলিত আছে। বিস্তর বাঙ্গালী মেয়ে-পুরুষ এলাহাবাদে মহাবীরজীকে পূজা করেন, ফুল, লাড্ডু, ধুতি দেন। এই প্রকাণ্ড মহাবীরজী মাটিতে সুখে শুয়ে আছেন, লম্বা হয়ে। লম্বালম্বি আধখানা দেহ মাটিতে পোঁতা। ও, টি, আর ব্রিজের প্রথম আর্চের তলায় শক্ত মাটির উপর। বর্ষাকালে ৩ মাস মহাবীর জলে ডুবে থাকেন, পূজা হয় না।

পূজার জন্য আপনার দুই সের মগজকা লাড্ডু ৩২ টা মহাবীরের বিকশিত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে ও কষে পূজারী সাজিয়ে দেন। পূজার পর দাঁত থেকে ১৬টা লাড্ডু 'প্রসাদী হ্যায়' বলে তিনি আপনাকে ফেরত দেন।

একাদশীর দিন পশ্চিমা বিধবারা অমৃতি ও হিং দেওয়া আলুর দম খান। এ দুটো নিষিদ্ধ নয়। সেদিন এলাহাবাদের আধপোষা বাঁদররা ভর-পেট অমৃতি খায় এবং মহাবীরজীর দেহ অমৃতিতে ঢাকা পড়ে যায়। দাঁত বের করে তিনি সকলকে লাড্ডুও দেখান। তিনি

পশ্চিমে ঠাকুর হলেও খৈনি খান, খান না, পচ পচ করে দেওয়াল রং করেন না; শ্বেত দন্তের রশ্মির ছটা সকলকে দেখিয়ে সন্তুষ্ট।

পোক্ত করে প্রাচীরে আঁটা দাঁড়ানো সিন্দুরে রক্তবর্ণ হনুমান পশ্চিমে সকল শহরে দেখা যায়। দুই একটি আফিসের বাঙ্গালী কর্ত্তা চাপরাশীদের জন্য দেওয়ালে আঁটবার পাথরের সুন্দর হনুমান কলকাতায় এনেছেন।

হরিদ্বারের একটি বাঙ্গালী সাধু কালমুখ ফুল-সাইজ লম্বা লেঙ্গুড়-ওয়ালা পাথরের হনুমান মন্দিরের মাঝখানে দাঁড় করিয়েছেন,—দেওয়ালে আঁটা নয়। ভক্তরা হাত জোড় করে বলে, "হাম লোক মহাবীরকা জুতিকা গোলাম হ্যায়।"

এই বানরকেই হিন্দুস্থানীরা 'হনুমান' 'হলুমান' বা 'লঙ্গুর' বলে। যে বানরের মুখ কাল নয় এবং বসবার শক্তমাংসে রাঙা 'ক্যালোসিটি' আছে তাকে 'বান্দর' 'বাঁদর' বা 'বাদর' বলে। এরাই নাচে।

এরাই শহরে বাড়ির ভেতর ঢুকে উৎপাত করে। খাবার দাবার চুরি করে মানুষকে চড় মারে, তা থেকেই কথা হয়েছে মাষ্টার কেলোকে বাঁদর-চড়া করেছে।' অর্থাৎ চটাস চটাস করে হঠাৎ বার বার থাবড়ে দিয়েছে।

চলতি কথায় দুটোই 'হনুমান' দুটোই 'বাঁদর', দুটোই রামচন্দ্রের সেবক। কালমুখটার লেঙ্গুড় খুব লম্বা, রাঙ্গাটার লেজ ছোট। একটা একশ বাঁদরের দল একটি মাত্র লঙ্গুর বা হনুমানকে দেখে ভীষণ ভয় খায়। তুলসীদাস 'লঙ্গুর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'রয়েল হিন্দুস্থানী ডিকশনারী' (রেভারেণ্ড টি, ক্র্যাভেন সংকলিত) বলেন এটা হিন্দি শব্দ ইংরাজীতে চলে, তবে 'অক্সফোর্ডে' নাই।

প্রয়াগের অনেক পাণ্ডার পোষা লঙ্গুর বা 'দুমদার হনুমান' থাকে তাকে পূজাও করে! আবার সে ভাড়াও খাটে। হিউএট রোডের দোতলা তেতলা বাড়িতে একবার লোকের টেকা ভার হ'ল রাঙ্গা বান্দরের উৎপাতের জন্য। তাই দু টাকা দিয়ে এক হনুমান ভাড়া করা হ'ল। তাকে যেমন ছাদের ওপর বসানো হল অমনি বাঁদরের দল দুপ্‌দাপ্‌ করে ও করগেটেড ছাপ্পর ঝনঝনিয়ে লাফাতে লাফাতে এ-ছাদ ও-ছাদ টপ্‌কে পালাল। ফিরে যাবার সময় হনুকে একলাই ছেড়ে দিন। সে চৌরাস্তায় খানিকক্ষণ দাঁড়াবে; শেয়ারের চলতি একায় সিট একটা খালি থাকলে, মিষ্টার হনুমান হাত তুলবে, একা ব্রেক কষবে, অন্য অন্য সোয়ারীরা নমস্কার করবে, আর তড়াক করে লাফিয়ে মহাবীর পবননন্দন ল্যাজ ঝুলিয়ে, একটা খোঁটা ধরে বসবে, আর একাওয়ালা ভক্তিভরে পাণ্ডাকে খুঁজে তাঁর বানর পৌছে দেবে, এবং রাস্তার ভীড় গাইবে একাওয়ালার সঙ্গে ঐকতানে :—

পবন-তনয় সংকট হরণ
মঙ্গল মূরতি রূপ!
ইত্যাদি

অত্যাচার সত্বেও বাঁদরের আদর এক এক পাড়ায় খুব বেশী। মহাজনী টোলায় একটা বাড়িতে মানুষ বাস করে, পাশের বাড়িতে একপাল বাঁদর বাস করে! একটার পর একটা বাঁদর ও মানুষ।

প্রয়াগে বানর সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মানুষের নাম 'মহাবীর প্রসাদ' 'হনুমান সিং,' এলাহাবাদের এক মহল্লার নাম 'বাঁদরিয়াবাগ', স্টেশনের নাম 'হনুমানগঞ্জ'।

একথা যদি সেখানে বলেন তা হলে কড়া উত্তর পাবেন 'বাঙ্গালী ভি রামদাস বোস হোতা হ্যায়, মহাত্মাকে নাম বালীগঞ্জ ভি হোতা হ্যায়, তরকারী কে নাম ফুলকপি হোতা হ্যায়, (ক্রোধভরে.) আপ কাঁহা হ্যাঁয়? (কি বকচেন?),

এলাহাবাদ ও লখনউয়ে ফুলকপিকে "গোবী" বলে।

এলাহাবাদে একটা বাঁদর ইলেকট্রিক তার ছুঁয়ে রাস্তায় পড়ে গেল। চিৎকার শুনা গেল 'উঠো মহাবীর! সুরজ আওর বিজলী তো তুমরা ইকৃতিয়ার মে হ্যায়—তুমরা কাঁক কে ভিতর।' দেখ্‌তে দেখ্‌তে নানারকম ফলমূল খাবার বাঁদরের সামনে জমে গেল। যে ছেলেটা রামলীলায় হনুমান সাজত তার বাড়ি এক মাস হাঁড়ি চড়াবার দরকার হত না। পুরি মিঠাই লুচুই-হালুয়া, পেড়া, বরফির পাহাড় জমে যেত। বাঙ্গালী হনুমান হলে দুদিন শুকনো শাকনা খেয়ে বলতো, 'মা গো দুটি ঝোলভাত রেঁধে দে, খোট্টাদের ক্ষীরের খাবার খেয়ে গলা চিরে গেল।

ভক্তদের দেখে বাঁদরে হাত জোড় করা শিখছে। রাস্তার ছোঁড়াদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো ও মুখ ভেংচানো দেখে তাও শিখেছে। এক অহিন্দু ভদ্রলোক গাছে প্রকাণ্ড বাঁদর দেখে বন্দুক নিশান করলেন। হনুমান হনুমান রামকে স্মরণ করলেন, এবং করুণ চীৎকার করে বন্দুকধারীর দিকে চেয়ে দুই হাত জোড় করলেন। বন্দুকধারীর দয়া হল, বন্দুক 'শোলডার' করলেন, প্রাণদান করলেন। বাঁদর কিন্তু দাঁত খিচিয়ে তাঁকে ভেংচে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটা দেখিয়ে 'উপ্' করে এ ডাল থেকে ও-ডালে পালিয়ে গেল! তিনি বললেন, 'ইয়া বেইমান কে আপ পূজা করতে হেঁ?'

অযোধ্যা হ'তে এক ধনী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক হালে কলকাতা এসেছেন। পার্শিবাগানের একটি বিখ্যাত নাতি-নাতিনীর দাদুর কাছে আশ্চর্য ঘটনা বলেছেন :—

"আপনার হাতে যদি খাবারের ঠোঙ্গা থাকে ও বীর বাঁদরের সামনে পড়েন, পালাবেন না, মারবেন না, তাহলেই কামড়াবে। সে খাবার কেড়ে নেবেই নেবে। অতএব ভক্তিভরে দান করুন। উন্‌কো তুষ্ট্‌ কিজিয়ে।" বহ মুর্খ নেহি হ্যায়।

"ঠোঙ্গাটা তার সামনে বাঁহাতে ধরে থাকবেন। তার স্বভাব হচ্ছে সে ডানহাতে খেতে থাকবে এবং যতক্ষণ খাবে তার বাঁ হাত দিয়ে আপনার ডান হাতটা বুলোবে ও আপনাকে এই রকমে আদর করবে। বান্দর যব পিয়ার করেগা, আপ জিন্‌ ঘাবড়াইয়ে! (জিন=না)

"এক সাহেব বন্দুক দিয়ে একটি বাঁদর হত্যা করেছিলেন। এই মহাপাতক তাঁর ডান হাতটা ততক্ষণাৎ লোহার মত আড়ষ্ট করে দিল। মালিশ, ইনজেক্‌শন, সেঁকতাপ কিছুতেই জড়বৎ ডান হাত ভাল হ'ল না। আমি সাহেবকে বললাম, যদি হনুমান আপনার হাতে হাত বুলোয় তবেই সারবে। ইতো আস্‌লি মরজ (রোগ) নেহি হ্যায়, ই-কপিরাজ কি সংহার; তুষ্ট দলন হৈ, লোহা কি বন্ধন।

"এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে সাহেব মংকি ব্রিজে গেলেন। একটা গোব্‌দা যুদ্ধপটু দলপতি লদর-বদর করতে করতে এসে ডান হাতে খেতে লাগল, আর সাহেব ভয়ে ভয়ে হাঁটুগেড়ে বসে তাঁর ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন। খেতে খেতে বানর হাত বুলাতে লাগল,— বস্‌, তিন রোজ মে মরজ গায়েব! সাহেব তনদুরুস্ত!

"তাজ্জব কি বাত ইয়ে হ্যায় কি তুলসীদাস কহ্তেহেঁ—

হনুমান বন্ধন কাটি

কষ্ট নিবারো!

হাত লাগাকে প্রভু

অসুর সংহারো।

"এহেন তুলসীদাস—ইষ্টাম্পকো উপর দুষ্ট্ পোষ্ট আফিস ইস্কন্দর সিহাই কে মোহর মারতা, যো পবিত্র তসবির নষ্ট্ করতা, রামায়ণ ভ্রষ্ট্ করতা।"

জার্মান অ্যানিম্যাল সাইকলজিষ্ট কক্ম্যাণ্ড কহলাম বলেন, "ঈসটে বানর এত সম্মান পেয়েছে শুধু তার বুদ্ধির জন্য।" অনেক সময় বোধ হয় মানুষ বাঁদর বুঝি এক, 'ইনকমটেক্স দেবার ভয়ে বাঁদর কথা কয় না।' লাহোর ফোর্টে বাঁদর পাখা টানতো, কলকাতায় চিরানিজ, হার্মষ্ট্রং ও কুক্স সারকসে ঘোড়ায় চড়তো, গাড়ি হাঁকাতো, সাহেব-মেম সেজে টেবিলে ছুরি কাঁটা চামচে দিয়ে খানা খেতো।

কানা ক্ষুধার্ত বাঘের পিঠে অদ্ভুত খোঁড়া বাঁদর চড়ে বসে। দুই অঙ্গহীন জীব শিকার করে। একের সাহায্য ভিন্ন অপরটা খেতে পায় না। বাঁদর বলে, 'লাফ মারো ঐ মস্ত ব্যাং, ঐ ব্যাংই এখন তোমার আহার। তুমি তো এখন আমাকে কাঁধে নিয়ে বড় জানোয়ার মারতে পারবে না: থামো বাঘ ভায়া, একটা কুলের গাছ এখানে; দুটো পেড়ে খাই।' এ বন্ধুত্বে লাভ আছে দুজনারই; বানরের ঘুরে-ফিরে খাবার ক্ষমতা নেই!

নৃত্যকলাতেও বাঁদরী আমাদের মেয়েদের হারায়। রাঙ্গা ঘাঘরা পরা বাঁদরীকে রক্ষক বলছে, 'এ জহুরন বিবি, চলো শ্বশুরার!' নাচতে

নাচতে জহুরন বিবি থেমে গেল, ঘাড় নাড়ল, রক্ষক দর্শকদের বলছে, 'বড়া ঘরানাকে লেড়কি হ্যায়, শশুরার নেহি যানে চাতে হেঁ!'

বৃথা ভয় দেখানকে বিহারে 'বান্দর গুড়কি' বলে। পালের গোদা মানুষকে ও অন্য বানরকে 'অ!' চিৎকার সহিত দন্ত বিকাশ করে হাঁকিয়ে দেয়। কামড়াতেই যে হবে তার মানে নেই। সদ্য-প্রসূতী বানরী অতি ক্রুদ্ধা ও দংশন-প্রবণ।

বানরী এককালে একটি বাচ্চা প্রসব করে। চার মাস বাচ্চাটা বুকে ট্রসের মতন নেপ্‌টে থাকে। বানরী বাচ্চা সমেত এ ডাল থেকে ও-ডাল হুপ্‌ হুপ্‌ করে লাফায়। বুক ছেড়ে বাচ্চা পাঁচ মাসে মাতার পিঠে হাফস্বাধীন হয়ে চড়ে থাকে। ছ মাসে ল্যাজ ধরে নেমে পুরা স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু গাছের কমনওয়েল্‌থের মধ্যেই থাকে ও পালের গোদাকে 'সেলাম সরকার' বলে!

প্রসব-বেদনায় কাতর বানরী একটা ডালে গর্ভবিমোচন জন্য বসেন। ভাবী নবকুমার প্রথমে দুইটি হাত বাহির করেন এবং নিকটবর্ত্তী একটা সরু শাখা দুই হাতে ধরেন। বানরী তখন হুপ্‌ বলে লাফিয়ে এ-ডাল থেকে ও-ডালে যায়। সদ্য-প্রসূত বাচ্চাটা সরু ডালে নাড়ী ও গর্ভপুষ্প সমেত ঝুলতে থাকে।

মাতা দাঁতে করে অস্ত্রোপচার করেন। দর্শকরা বলে, 'দরখ্‌ কি টেহনী পর বিমল প্রসূতিরূপ বিরাজে!' [উচ্চ ডালে মাতৃরূপের মনোহর দৃশ্য] ভক্তরা ভজন গায়:—

অঞ্জনিপুত্র পবনসুত আবা
বিকটরূপ ধরি লংক জরাবা!

এই থেকেই বোধ হয় 'লংকাপোড়া ছেলে' কথা রচনা হয়েছে—যে এত বিকট যে লংকাতে নিজের ন্যাজ পুড়িয়েছে, মুখ পুড়িয়েছে ও লংকাও পুড়িয়েছে (লংক জরাবা)।

কেউ শাঁক বাজায়, কেউ ব্যাগপাইপ ডাকতে ছোটে, কেউ এই উচ্চডাল-সংলগ্ন দোদুল্যমান শিশুর দিকে তাকিয়ে বলে 'রাম দুলারে! তোমরা মদত্ সে রাম সব বাঁদরো কো লেকে সীতা উদ্ধার কিয়ি আওর লড়াই ফতে করেথে।'

১৩৫৯

বুড়ো সাবধান

দৈবানুগ্রহ ব্যতীত আশী-পঁচাশীতে বৃদ্ধদের কোনও ঔষধে উপকার হয় না। তাদের চিকিৎসা গুরুতর ব্যাপার; ডাক্তার বৈদ্য সাবধানে হস্তক্ষেপ করেন। পুরনো প্রেস্ক্রিপসনের ডোজ কমিয়ে দেন বা বাতিল করেন।

ষাট বছর বয়স থেকে একাশী পর্যন্ত কি কি ভুল করেছি কৃতকর্মা শিল্পীর মতন অন্যান্য (বয়সে কম) বৃদ্ধদের যৌতুক দেব। চতুর বৃদ্ধেরা বুঝবেন যদিও যৌবনের কবল থেকে উদ্ধার হয়েছেন, বার্ধ্যক্যের কবলে পড়েছেন; পদে পদে বেশী ভ্রম হবে।

এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে বার্ধক্যে 'ফ্রাকচর' হয়। আমি মনে করেছিলাম সেই পুরনো জোর বজায় আছে। ট্রামে মোশনে উঠতাম নামতাম, বড়ই আনন্দ বোধ হ'ত। এ বুদ্ধি হ'ল না যে বাহুর জোর যা দৃঢ়বলে চলন্ত ট্রামকে বক্ষে টেনে নিত ভেতরে ভেতরে উবে গেছে। ট্রামের হাতল থেকে হাত ফস্কাল, ওয়াই. এম. সি-এর কাছে চিৎপাত। বাঁ হাতে ফ্রাকচর। বুড়োর হাড় কি সহজে জোড়া লাগে? কি বেদনা!

একদিন সারকুলার রোডে বেড়াচ্ছি সামনে একটা আমের খোলা পাড় আছে। নজর হয়নি। পেছুদিকের ভদ্রলোকটি তা দেখে হেঁকে সতর্ক করলেন 'বুরা সাবধান'! ফিরে দেখি পূর্ববঙ্গের বন্ধু চানু— বিলেত ফেরত। আমাদের জেলাতেও 'বুরো' বলে, এটাকে বানান ভুল বা প্রিন্‌টিং মিস্‌টেক ভাববেন না।

কলকাতার এক বিখ্যাত বাঘ শিকারী সত্তর বছর বয়সে মনে করতেন বাহুতে আগেকার জোর বজায় আছে। সকলে সাবধান করল, যেও না। শুনলেন না বাঘের হাতে প্রাণ দিলেন। বার বছর বয়সে রাম ধনুক ভেঙেছিলেন, সত্তর বছর বয়সে কি আর পারতেন! শিকারীর বন্দুক সত্তরে অত সহজে ধরা যায় যায় না; গুরুভার বোধ হয়। একটি নব্বই বছরের বৃদ্ধ বলেন, 'অবাক্ হই ভেবে কেমন করে আমার মোটা বউকে ত্রিশ বছর বয়সে বিছানায় ক্যাঁক্ করে ধরে বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে সরিয়ে দিতাম। এখন তো আমার ছোট্টো পাঁচ বছরের নাতনীটাকে তুলতেই পারি না।'

ষাটে পা দিলেই ট্রাম বস্ চড়া বন্ধ করবেন; ফুটপাথেও সাবধান। অনেক বৃদ্ধের ফুটপাথে ফ্রাকচর হয়। প্যারালিসিস্ ভগবানের হাত, কিন্তু ফ্রাকচর বাঁচান আপনার হাতে। তবে কি বিছানায় শুয়ে থাকবেন? ফ্রাকচরের কেতাবে পড়েছি বিছানায় পাশ ফিরতে গিয়েও বৃদ্ধের ফ্রাকচর হয়। তবে তাই—বিছানাতেও শুয়ে কাজ নেই।

চটি জুতার তলাটা একটু ভিজে ভিজে রাখবেন; ঘরের মেঝেতে তা হলে পা স্লিপ করে পড়বেন না। পড়লেই ফ্রাকচর। একবার জুতাটা যাতে না ভেজে, সেই চেষ্টায় জব্দ হয়েছিলাম। স্নান করে বাথরুমের শুখনো ধাপের ওপর শুখনো চটি রেখেছি। একটা চটি পরতে গিয়ে পা স্লিপ করল, দরজা ধরে ফেলে পতন বাঁচালাম, কিন্তু বাঁ হাঁটু মচকে গেল, দশ বছরেও বেদনা যায় নাই। বসলে উঠতে পারি না। বাপপিতামোর বাত থাকলে, চোট লাগা বা মচকানো অঙ্গে বাত দাঁড়িয়ে যায়।

মচকাবার পর ডাক্তার বললেন, আপনার খুব কপাল জোর যে, মাত্র বাঁ ঠ্যাং খোঁড়া হয়েছে। যদি পড়তেন কোমরের হাড় ফ্র্যাকচর হত; হয়তো মরণ পর্যন্ত শয্যাশায়ী থাকতেন, জোড়া লাগতো না,—প্যারালিসিসের চেয়েও বেশী পরবশ হয়ে থাকতেন।" ষাট পৌঁছলেই সাবধান হবেন যাতে ৮০, ৯০-এ পরবশ না হয়ে পড়েন। এই বয়সে অর্থাৎ ৯০, ৯৫ বা ১০০-সকলেই 'উইডোয়ার' এই সুবিধা। নিজের সেবা করলেই হল, দুজনের নয়। অনেক আত্মীয় আগেই মরে গেছেন, সেবা করবার লোকও থাকে না, যদি থাকে,—পেটের দায়ে, বিদেশে।

যতই স্নেহের বন্ধু হন না কেন, বৃদ্ধ যখন বিছানায় অসামাল হন, সকলেই গ্রীবা বঙ্কিম করে প্রস্থান করেন, বন্ধুত্বের মোহ কেটে যায়। নার্স ভরসা।

এই বেসামাল অবস্থাকে ডরান না এমন বৃদ্ধ নেই, আসল মৃত্যু তো তুচ্ছ। চীন সফরের পূর্বে নেহেরুও বলেছিলেন:—

'আমি বেসামাল অবস্থার সৃষ্টি করতে চাই না। কিছুদিন যাবৎ এই চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে।'

মহাত্মা বলেছিলেন, প্রত্যেক জননী নিজের শিশুর মেথরানী; প্রত্যেক মানুষের নিজের মেথর নিজে হয়ে স্বাধীনতা লাভ করা উচিত; পরবশ ঘৃণার্হ। কিন্তু মৃত্যুকালে 'জমাদারের,' মত গায়ে জোর আসে কি ক'রে?

নার্স্-ও যখন থাকবে না, মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে রাখবেন:—
'No man is alone; God is with him!"

অতিবৃদ্ধের কি বাঁচবার দরকার আছে? বুড়োরা মনে করেন, আমরা বেঁচে না থাকলে বুঝি পৃথিবী চলবে না। অসুখে পড়ে এক

বৃদ্ধ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ডাক্তার মশায়, আমি বাঁচবো তো?' ডাক্তার হেসে জবাব দিলেন, 'আপনার আর বাঁচবার দরকার কি বলুন না?' বৃদ্ধ হতাশ হল, মৃত্যুর করাল ছায়া তার মুখ ঢাকলো। তারপর তুমুল রবে—বল হরি হরি হরি বোল!

অপ্রিয় সত্য বৃদ্ধের প্রাণ নাশ করে, মিথ্যা কথায় বৃদ্ধ জোর পায়, —'কত্তা গো আপনি দুশো বছর বাঁচবেন!'

এলাহাবাদে রবাই ঘোষ নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন, সর্বদা মৃত্যুভয়ে অভিভূত। নাইনটি নাইন টেম্পারেচারেই 'মধুসূদন, বাঁচাও এ যাত্রা!' বলে কাঁদতেন। তাঁকে সকলে উৎসাহ দিত, ভয় কি রবাই দাদা, আপনার চেয়ে বয়সে বড় মতি ময়রা, তার চেয়ে বেশী বুড়ো রমেশ ডাক্তার। ওরা মলে তবে আপনার পালা।' সামলে নিতেন। একদিন রমেশ ডাক্তার মরলেন; রবাই দাদার কম্প দিয়ে জ্বর এল। 'ভয় কি? এখনও মতে ময়রা বেঁচে।' সামলে উঠলেন। তার পর রোজ খোঁজ নিতেন মতে ময়রা কেমন আছে, ও তার একটু অসুখ হলেই চিকিৎসার খরচ দিতেন।

মনে মনে হেসে বৃদ্ধকে ডেকে ডাক্তার বললেন, 'কই আপনার তো কিছুই হয়নি! আপনি বড় নারভাস্, ও ব্লড প্রেশার সকলেরই আছে।' আমাকে এক বিচক্ষণ ডাক্তার উপদেশ দিয়েছিলেন 'ব্লড প্রেশার দেখো না।'

আর এক বিখ্যাত ডাক্তার বললেন, খাবার ঔষধ কখনও দেব না। এই লোশন পায়ে লাগান, আর মনে মনে ভাবুন ওটা কিছুই নয়! অনেক বিলেতি লোশনে লেখা থাকে 'নট টু বি ইউজড্ বাই ওল্ড মেন।' বৃদ্ধের ব্যবহার নিষেধ।

দুজন মেন্‌ট্যাল স্পেশালিস্ট আমাকে বলেছেন, 'যদি হরদম ভাবেন আঙ্গুলের বেদনা আছে তাহলে আঙ্গুলের বেদনা বাড়বে; ওটাকে অগ্রাহ্য করুন, দেখবেন শীঘ্র আরোগ্য হবেন।' আর একজন বললেন 'বুড়োদের আঙ্গুল সারেই না।' ছেলেবেলায় অনেক বৃদ্ধদের আঙ্গুল দেখে হাসতাম। দরজায় চিমটানো, বোতলে কাটা, সিন্দুকে থেঁতলানো আঙ্গুল জীবনভোর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এক বুড়ো তাঁর ঘোড়াকে আদর করেছিলেন থাবড়া মেরে। চিরকাল আঙ্গুলগুলো ফুলো ছিল আর বেদনা।

৭০-৮০তে পৌছুলেই হাত পায়ের আঙ্গুল সাবধান, একটু কাঁটা ফুটলে বা কেটে গেলে সারবে না, রাঙা হয়ে চিরকাল ফুলো ও বেদনা থাকবে। ডাক্তার বলেন, 'নিউরাইটিস! বেরিন খান! বেরিন খান!' কিছুই হয় না,—কেবল টাকা নষ্ট! আলপিন ফুটে অনেক বুড়ো মরেছেন, আলপিন ছুঁচ ছোবেন না; 'নিবে' হাত দেবেন না, 'নিবে' লিখবেন না। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় দৈবাৎ বুকে 'নিব' ফুটিয়ে ফেলেছিলেন; সে ঘা সারেনি। পোস্ট আফিসে আলপিন বেঁধা কোনও জিনিস নেয় না। আলপিনের খোঁচায় এক পোস্টাল অফিসার মরেছিলেন।

বৃদ্ধ হবেন যখন চাকরকে বকবেন না, যতই দোষ করুক। তৎক্ষণাৎ ব্লড প্রেসার লাফ দেবে, ধপ করে মাটিতে পড়বেন,—হয় ফ্রাকচর, নয় অ্যাপোপ্লেক্সি—দু একদিনে খাটিয়ায় নিমতলা যাত্রা। এ রকম হঠাৎ মৃত্যু ভাগ্যবানদেরই ঘটে, বেশী ভুগতে হয় না। এই যা সুবিধা। জোয়ানদের ভয় দেখাচ্ছি না। কেবল, ৮০, ৯০, ১০০র কথা বলছি।

যে বৃদ্ধ আমার মতন আশীতেও কুঁজো না হয়ে হাটেন তাঁর পড়ে যাবার ভয় বেশী। ইচ্ছা করে একটু stoop করবেন, বিশেষ করে সিঁড়ি ওঠবার নামবার সময়। কলেজের ছেলেদের অনেকেরই যুবা বয়সে 'স্টুপ' দেখতে পাওয়া যায়, স্টুডেণ্ট ওয়েলফেয়ার রিপোর্টে এটাকে 'উইকনেস' বলে, পশ্চিমে বলে মাটি দেখতে দেখতে যাচ্ছে, কবর কোথায় হবে। বাংলায় বলে হারানো যৌবন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পড়বেন না মাথা ঘুরবে; লিখবেন না মাঝের আঙ্গুলের গাঁটটা পেকে উঠবে। পেটভরে খাবেন না, ব্লড প্রেশার বাড়বে। যদি কাসির জোর বেশী থাকে তবে তার ঔষধ শিখে রাখুন,—কাসবেন না। সে তো নিজের হাতে।

ভাঁরি কেতাব তুলবেন না। 'ওয়েবস্টার' তুলতে আমার হারনিয়া বেরিয়ে গেল। এই কষ্টকর রোগের চেয়ে মানে এবং বানান ভুল ভাল। হারনিয়া ও 'মিগরেন' বৃদ্ধ বয়সের রোগ।

রোদে তাকাবেন না, 'মিগরেন' জোর করবে; আমি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা অন্ধ হয়ে শুয়ে থাকি, চোখ বুজলেও ঘরের আকাশে উড়ন্ত চাকি দেখি এবং রং চং করা ভাসন্ত পদ্মফুল। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি খোলে।

৬০ হলেই কমোড অভ্যাস করবেন। কাঠের ফ্রেম অর্ডিনারি পায়খানায় বসাবেন। তা হলে ৮০-৯০এ ধরে ওঠাতে হবে না, দুই হাতে কাঠের উপর ভর দিয়ে উঠবেন। সাহেবী অভ্যাস আগে থাকতে না করলে ৮০তে কৃতকার্য হবেন না। কেউ কেউ পারেন দেখছি। যে সাহেবরা পালিয়েছে তাদের 'কমোড' খুব সস্তায় মল্লিক বাজারে পারেন।

কলকাতায় যেমন ফুটপাথেও বুড়োদের বিপদ ঘটে, গোবরে পা হড়কে যায়, পাড়াগাঁয়ে তেমনি সাপের ভয়। হয় বুট পরবেন, না হয় আমি পাটনা গ্রামে যেমন করি, তালি পিটুতে পিটুতে অন্ধকারে চলবেন।

কলকাতায় ৬০ থেকে ৯০ বছরের বুড়ো আছেন চার লক্ষ। সকলেরই চোখে ক্যাটারাক্ট, সাপ খোপ দেখতে পান না; কোনও রকমে সংবাদপত্রের হেড লাইন পড়েন, বাকি খবর দেখতে পান না। বুড়োদের জন্য একটা কলমে বড় টাইপে সমস্ত ইমপরট্যাণ্ট খবর সাঁটে ছাপা উচিত। বুড়োরা পেছিয়ে পড়ছে। এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে! উড়ন্ত চাকী কি ট্যাকসি স্ট্যাণ্ডে ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে?"

ছানি পড়া চোখে রাস্তাঘাট চলা বিপজ্জনক; তবে কি দিনরাত বাড়িতে বসে থাকবেন? বাড়ি-ই বা কোন্ নিরাপদ,—পাটনা ভূমিকম্পে ঘরে ছিলেন বলে অনেক বৃদ্ধ প্রাণ দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি বেরুতে পারেন নি। কাজ নেই তাই বাড়িতে থেকে। প্রথম হ্যাঁচকাতেই আমার সামনে ৫০০ বুড়ো মরল।

পুঃ। এক অতি বৃদ্ধের স্টুপ (stoop) দেখেছিলাম উলটা দিকে,—অর্থাৎ পিঠের দিকে কন্‌কেভ, পেটটা কনভেক্স হয়েছিল। দু হাতে দুটি লাঠি নিয়ে পেছু হাঁটত সামনেও হাঁটত, দাঁড়াবার সময় সোজা দাঁড়াতে পারত। সোজা দাঁড়িয়ে চলতে কিন্তু পারত না।

আমার নিজের কথা বললেই বার্ধক্যের আগমন মোটামুটি বুঝবেন। ৬২তে বেশ জোর, ট্রাম ট্রেন ঘরবাড়ি; ফ্রাকচর জুড়েছে, কিন্তু এখনও টন টন করে, ঘাড় বেঁকে গিয়েছিল, হাত উঠতো না। এখনও স্টিফ কিছু। প্যালপিটেশন কখনও কখনও।

৬৩তে হাঁফ ধরা বেড়ে গেল, চলবার ক্ষমতা হঠাৎ কমে গেল। ডাক্তার থার্ডলেগ হুকুম করলেন, লাঠির সাহায্যে হাঁটা সহজ হল। ৬৪তে দু পা চলি দু পা থামি। সিগারেট পরিত্যাগ, ছানিতে সব ঝাপসা দেখি।

৭০এ মাত্র ১০ মিনিট চলতে পারি, তারপর জিরিয়ে আবার হাঁটি। সিঁড়ি ভাঙা কষ্টকর। মাথা ঘোরা আরম্ভ। মেকি দাঁত ফেলে দিলাম। ১৫ খানা লুচির জায়গায় মাত্র ১০খানি খাই।

৭৫—লুচি ৮ খানা, মাংস এক পো স্থানে ৩ ছটাক, মাড়িতে চিবিয়ে খাই।

কলা রোজ ১২টার স্থানে ৬টা, কমলা নেবু যত পাই, বেল, আম যত দেবেন। ৬টা ল্যাংড়া পাই তো একেবারে খাই। একদিন অন্তর 'বাউয়েলস্' মুভ। দুই বেলা দই। লুচি বেড়ে গেল আবার ১২ খানা। হরদম খিদে, ডাক্তার বললেন, 'ডায়েবেটিস নয় তো।' ইউরিন একজামিন করে এক ডাক্তার বললেন, ১৮ বছরের ছোকরার মতন। বুড়োকে ছোকরা বললে কি আনন্দ হয় বুড়োরাই বোঝেন।

৮০—হঠাৎ হাঁটবার ক্ষমতা কমে গেল। সিঁড়ি ভাঙা প্রায় অসম্ভব। ঘরে বন্দী। লুচি ৪ খানা, মাংস ২ ছটাক রোজ। কলা ৪টে। হরিণঘাটার দুধ চিঁড়ে দিয়ে। একজন বলেছেন দুধ-চিঁড়েতে নাকি 'সেকেণ্ড ইউথ' হয়। দেখা যাক। এক বৃদ্ধ সারকুলার রোডে সাইনবোর্ড দেখেছিলেন 'যৌবন মাদুলি ২॥০ দাম। বৃদ্ধদের জন্য; তিনদিনে নবযৌবন, নচেৎ মূল্য ফেরত!' একটা কিনে পরেছিলেন। চারদিনের দিন 'দূর শালা' বলে ফেলে দিলেন।

৮১—সিঁড়ি ওঠানামা বন্ধ; টলমল শরীর সিঁড়ি দেখলে। বেড়ানোর ক্ষমতা আছে, বারান্দাতেই বেড়িয়ে বেড়াই। আবার লুচি ৮ খানা, ময়দা-আটা মিশিয়ে, কপি আলু দিয়ে চড়চড়ি। ২ ঘণ্টা অন্তর খিদে, এটাই রোগ, হাওয়া বদলালে হয়তো খিদে কমে। রাত ১২টায় চা, বিস্কুট, রাত ২টায় চা টোস্ট; ভোর ৪টাতে চা গরম লুচি। বেলা ৮টার সময় যা ফল পাই গো-গ্রাসে গিলি। এ-বেলা ২ ছটাক, ও-বেলা ২ ছটাক ছাগল দুধ। মাছ ডিম খেলে র‍্যাশ বেরোয়। বোলতা কামড়ালেও গায়ে র‍্যাশ হয়। কুইনিন খেলেও 'আলারজি' বা 'ইডিওসিন্‌ক্রাসি' থাকলে কম্প দিয়ে র‍্যাশ বেরোয়। গায়ের veins নীল রং হয়ে গেছে। গীতা পড়ি নি, কখনও পড়বো না।

রাস্তা একলা চলবেন না। ফুটপাথে বেড়াবার সময় একটি আমার নতুন এসকর্ট বাহাল হয়েছিল। বললাম, 'ছাখ্ আমি পড়বার আগে আমাকে ধরে ফেলবি।' সে বলল 'যে আজ্ঞে! আমাকে পড়বার আগে বলবেন।' আমি বললাম, 'ও রে বোকা, আমি কি করে জানবো যে, আমি এবার পড়বো?' সে বলল 'আজ্ঞে আমি-ই বা কি করে জানবো যে আপনি কখন পড়বেন? বাবু! এ সব ভীমরতির কথা, অন্য লোক দেখুন।'

ভীমরতি দেখেছি ৯০ বছরের বৃদ্ধার। দশ বছর বিছানায় পড়ে, চলবার ক্ষমতা নেই। স্মরণশক্তি একেবারে গেছে, কেবল বাল্যকালের কথা বলে দুঃখ করতেন। মেণ্টাল স্পেশালিস্ট দেখতেন, বলেছিলেন বাহাত্তরে বা ভীমরতিতে কেবল প্রথম সন্তান ও প্রথম যৌবনের কথা মনে থাকে আর সব মুছে যায়। এলাহাবাদে একটি ভীমরতি পেশেণ্ট আমাকে দেখে বললেন 'আরে কে ও? দশরথ যে

অযোধ্যার সব কুশল?' এ দশরথ রামের পিতা নন, তাঁর বাঙালী বাল্যবন্ধু, অযোধ্যায় তাঁর সঙ্গে পড়ত।

মরবার সময় কোন দেব-দেবীর প্রতি রাগ রাখবেন না। আমাদের দেশের এক বুড়োর প্রাণ কিছুতেই বেরুচ্ছে না, কেবল কষ্ট পাচ্ছে। সমস্ত দেব-দেবীর নাম লিখে অঙ্গ ভরে গেছে কিন্তু মনসার নাম কিছুতেই লিখতে দিলেন না; মনসার উপর তাঁর জাতক্রোধ। কিছুতেই প্রাণ বেরোয় না। কোনও না কোনও দেবদেবী অসন্তুষ্ট আছেন দেখে ছেলেরা বলল, 'বাবা কেন আর মনসাকে অপমান করেন, তাঁর নাম লিখলেই লিস্ট পূর্ণ হয়; তখন প্রাণও বেরুবে; এত কষ্ট দেখতে পারি না।' বুড়ো বুঝলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথাও তিন অক্ষরের মত স্থান আছে?' ছেলেরা পরীক্ষা করে বলল, 'বাবা! কোমরে ঘেঁটু, হনুমান ইত্যাদির কাছে স্থান আছে।' বুড়ো বলল, 'লেখ্ ও বেটীর নাম ওখানেই লেখ্, ওকে আমি বুকে কপালে স্থান দেব

গ্রামে এক বাড়িতে চার পুরুষ বুড়ো বর্তমান, একটির বয়স ৬০, তার বাপ ৮০, তার বাপ ১০০, তার বাপ ১২০। মাচা থেকে একটা প্রকাণ্ড কুমড়ো ধপ করে পড়লো। ১০০ বছরের বুড়ো তাড়াতাড়ি উঠে কুমড়ো তুলতে গেল। ১২০ চেঁচিয়ে বললেন, 'হাঁ হাঁ হাঁ তুই বুড়ো মানুষ পারবি না, সরে দাঁড়া, আমি কুমড়ো উঠাচ্ছি।' আহা কি আশ্চর্য মায়া বাপের অন্তরে!

আবার এক বুড়ো আর এক বুড়ো বেঁচে আছেন শুনলে মহা খুশী হন। এক বৃদ্ধ এসে বললেন। 'ভালো তো?' নমস্কার করে বললাম, 'আসুন! পিসেমশায়, বসুন!—আমি মেসোমশায়কে খবর

ছি'। বললেন, 'অ্যা মেসো এখনও বেঁচে?' মেসোকে গিয়ে বললাম, 'ও গ্রামের পিসে এসেছেন।' মেসো আনন্দে বললেন, 'অ্যা পিসেমশাই এখনও বেঁচে?'

বেশীদিন যদি বাঁচতেই হয় তবে গ্রাম্য বৃদ্ধাদের মত বাঁচতে ইচ্ছা হয়। স্বামী ইত্যাদি সকলেই মরেছে। জীবনের যত বিপদ ও ভাবনা কেটে গেছে; এক বেলা খাবার মতন পয়সা আছে, শোবার মতন দুটো ভাঙ্গা ঘর আছে, একটু বাগান আছে। আশপাশে অন্যান্য বৃদ্ধা বান্ধবী আছে। হাসি-তামাসা চলে; শরীর রোগা দেখতে, কিন্তু কর্মঠ; ভোজবাড়ি খাটেন। এই মজবুত দেহের ভিত্তি কি?—ভাবনাশূন্য মন।

এ রকম একটি বৃদ্ধা আমাকে বললেন, 'হ্যা দাদা! এস না গ্রামে নিজের ভিটেতে বাস কর!' উত্তর দিলাম, 'দিদি! ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসি না।' তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কোজ্ যাবো মা! বেলা দশটায় কম্প দিয়ে জ্বর আসে, লেপ মুড়ি দিয়ে শোবে, বেলা ৪টায় ঘাম হয়ে জ্বর ছেড়ে যাবে, তাতে ভয় কিসের? দশটা-চারটে শহরে অফিস করে লোকে কি করে?"

আর না হয় তো পাটনা মহুয়াবাগ গ্রামের দীপলালের মতন বুড়ো হতে ইচ্ছা হয়। লম্বা হাড়বহুল দেহযষ্টি, মুগুর-ভাঁজা বাহু, বয়স ৯০, আথ চিবানো ৩২টা দাঁত হাসছে হরদম। গ্রামে কারো অসুখ হলে এই নব্বই বছরের বুড়ো তাকে কাঁধে করে বাঁকিপুর মেডিক্যাল কলেজে ৬ মাইল নিয়ে যায়। নিজে রোজ ৪ মাইল গিয়ে গঙ্গা স্নান করে, আমার বাড়ির জন্য একঘটি গঙ্গাজল আনে। আমাকে বলে 'বুঢ়া বাবু! মেরে কাঁধা পর সওয়ার হো কর গঙ্গা নহানে চলিয়ে।

সব বেমারী ছুট যায়গা!' তাকে বললাম 'রাস্তার লোক দেখলে যে হাসবে!' সে বলল, 'হায় বুড্ঢা! আপ সড়ক কে আদমী কো ডরতে হেঁ? হাম দুনিয়া মে কিসি কো নেহি পরোয়া করতে!'

পশ্চিমে দস্তুর আছে কোন ৯০ বা ১০০ বছরের বুড়ো যখন ১০ বছর শয্যাশায়ী অথচ কিছুতেই মরছে না, তখন তার আত্মীয়-স্বজন তাকে গাল দেয়—"বুড্ঢা মরি বি না? দূর হো! মর হো! কব মরোগে ই তো বাতলাও?"

কলকাতার একজন জেনারেল প্রাকটিশনার আমাকে বলেছিলেন, "১০ বছর ভুগে একটা বাঙ্গালী বুড়ো যখন মরে, তাকে পুড়িয়ে এসে আত্মীয়রা বেহুঁশে মনের সুখে ঘুমায়—সেবা করার মেহনত ঘুচলো। ৩ দিন শুধু ঘুমিয়ে-ই সকলের চেহারা ফিরে যায়।" বাড়ীতে বৃদ্ধ থাকা কি ভয়ানক বুঝুন, সকলে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধকে "দীর্ঘজীবী হও!" বলা তাহলে অভিসম্পাত—আশীর্বাদ নয়, অথচ সকলেরই প্রমাই বাড়াতে ইচ্ছা। আমার যখন ৭৪ বছর বয়স, পাটনায় এক সায়েনটিস্ট প্রোফেসার অফ আনাটমী এবং এক বিচক্ষণ ডাক্তার একটা কালো চুকচুকে পাশিকে নিয়ে এসে হাজির। তার হাতে তাড়ির 'লাবনী' বা ভাঁড়। বিকট সৌরভ! সকলে বললেন, আধ টম্লার খান তো দাদা, অ্যালারজীর র‍্যাশ, আম-বাতের উপদ্রব, উপবনের 'হে ফিভারের' হাঁচি, হারনিয়ার ব্যথা, চোখের ইনফ্লামেশন, যেখানে সেখানে হারপিস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, পাইল্সের যন্ত্রণা, আঙ্গুলে হাতে নিউরাইটিস, ঘুমের অভাব, অসাড় পা দুটো, হরদম খেতে ইচ্ছে, নিউরেলজিয়া, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, ভূতে বিশ্বাস, আরশোলাকে ভয়, মাছের মুড়ো বাঘ হয়ে স্বপনে গিলতে আসছে এবং অন্য অন্যান্য

'স্ত্রীমরতির লক্ষণ সব ৭ দিনের চলে যাবে। টক দইএর ঘোলে ১০ ফোঁটা কেরাসিন দিলে যেমন খেতে হয়, তাড়ি সেই রকম লাগে। 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত ভিটামিন তাড়িতে,—"পশ্চিমা জওয়ান" তাতেই সৃষ্টি হয়। ৭ দিনে কিছু উপকার হল; কিন্তু তাড়ির 'কিউমুলেটিভ' ফল ভয়ানক হ'ল। শ্রীনেহেরু যে অবস্থা সৃষ্টি করতে ভয় খাচ্ছেন, সেই অবস্থা হল,—বেসামাল।

ফুলের রেণু আবার নাকি চোখে লাগলে 'আলারজী' পেশেণ্টের দৃষ্টিনাশ হয়। হাওয়ায় উড়ে চোখ রাঙা করে। কথায় বলে "ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়।" গানেও আছে "চাইবো না লো কুসুম পানে, চাইবো না লো আর।" ডাঃ অসলারের 'হে ফিভার' পড়ে দেখি—বৃদ্ধের এই কষ্টকর রোগ থেকে কিছু অব্যাহতি পাবার একমাত্র উপায় বাগান ছেড়ে ঘিন্‌জি শহরে বাস।'

১৩৬১

নেতাজীর বার্তাবহ

[এই গল্পে সৃষ্ট চরিত্র সকলই কাল্পনিক]

আমি সন্ধ্যার পর নিজের ক্যাম্পে ম্যাপ দেখে আন্দাজ করছিলাম, ডোংরা থেকে প্লিন্টিন গ্রাম কয় শত মাইল, এমন সময় হঠাৎ নেতাজী ঢুকে আমার কাঁধ দুটা জোরে নেড়ে বললেন, "জেনারেল লাঘাটে! শীঘ্র এস আফিস ঘরে, আমারও ডাক পড়েছে। ১নং টনচিন ক্যাম্প থেকে এই অন্ধকারে ক্যাপ্টেন চন্দ্রমা চৌবে এসে বসে আছেন। ডিব্রুগড় থেকে যে শত্রু আমাদের ধ্বংস করতে আসবার কথা আছে তার বিশেষ খবর এনেছে বোধ হয়। এ মেয়ে অফিসারটি আমার সংবাদ বিভাগের প্রাণস্বরূপ হয়ে আছে। বড় ভাল মানুষ। আমি একে ব্রেভেট র‍্যাংক দেব।" আমি তখন নেতাজীর সঙ্গে ডোংরা ক্যাম্পে থাকতাম, (নং ২)। মেজর-জেন ওহেদুল হক ও দোভাষী জাপানী কিমাশিমপো ও জার্মান ইন্‌টারপ্রিটার বেকলার সাহেব পথে আমাদের সঙ্গী হলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই ক্যাম্পের বৃহৎ অফিস ঘরে দেখলাম, জেনারেল মুখার্জি, লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল ঘোষাল, মেজর-জেনর‍্যাল থাপারডে ইত্যাদি হোমরা-চোমরা বসে আছেন। নেতাজীকে সকলে স্যালিউট করার পর ক্যাপ্ট. চন্দ্রমা বললেন, "কাল ভোরে এক্‌ঠো আওয়াজ হুই থি; আডভানস্ গার্ড গোরে ইস-কদর জমায়ৎ হুয়া কি আপকো ক্যাম্প ফুরতি সে তোড়নে হোগা।"

আমি বললাম, "হাঁ ঠিক বটে; এ সপ্তাহে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নই। পিনটিনে দু শ মাইল হয়তো পেছিয়ে যেতে হবে। পাক্কা খবর কব দিজিয়ে গা?"

ক্যাপ্টেন চন্দ্রমা চৌবে বলল, "কাল স্থবে তুঙ্গি ; এক্ হুসিয়ার কবুতর .দিব্জিয়ে, নেতাজী, ইমানদার, চতুর।" দিনের আলোতে মানুষ পাঠানো বিপজ্জনক। লুক্কায়িত গোরা পিকেট দড়াম করে গুলি করবে।"

নেতাজীর সতেরটি বার্তাবহ পায়রা তখন এই ২নং ক্যাম্পে ছিল। তিনি নিজে লফ্‌টে অর্থাৎ মাচানে উঠে একটা ধপধপে সাদা পায়রা নিয়ে হাসতে হাসতে নেমে এলেন। বীরপদভরে অতি মজবুত বাঁশের মই নিমেষের তরে দমিত, পরে পুনরায় অবক্র। নেতাজী বললেন, "এ পায়রাটির নাম 'টিপু সাহেব'।"

সুন্দর চুড়ি-পরা হাতে চন্দ্রমা পায়রাটাকে আদর করলেন। ল্যাজটি টেনে বললেন, "তুম লাগ গি হায।" নেতাজী পকেট থেকে দু চার মুঠা মটর নিয়ে চন্দ্রমার আঁচলে গিট দিয়ে বেঁধে দিলেন। ব্রীড়িত কপোলে দুটি গোলাপ ফুটল।

ইলেকট্রিক বেলের অভাবে মাচা থেকে একটা দড়িতে ঘরে ঘণ্টা বাঁধা আছে। মাচাতে দড়ির শেষে মটর বাঁধা পুঁটুলি আছে। পায়রা চিঠি নিয়ে এসে আকাশ থেকে এই উঁচু মাচায় নামে ও মটর টানে ; ঘরে ঘণ্টা বাজে। আমি ও নেতাজী পিজন রেসিং সোসাইটির মেম্বার ছিলাম। আমাদের দুজনেরই পায়রা পায়রা বাতিক ছিল।

মেজর-জেন থাপারডে ইংরেজীতে বললেন, "ইওর একসেলেনসি, আমাদের সাতটি ক্যাম্পে লোক উপচে পড়ছে। স্থানাভাবে এতগুলো ক্যাম্প হয়েছে। ছ'টার মধ্যে ক্যাম্প ভাঙা হতে পারে যদি সত্যই কাল যুদ্ধের ভয়ে আপাতত রণকৌশলোপযোগী পশ্চাদপসরণ করতে হয়। কাল সৈন্যবিন্যাস অসম্ভব। পিনটিন জঙ্গলে এই স্ট্রাটেজিক রিট্রিট করতে হবে।"

ক্যাম্পগুলো সব আট দিন পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। চারিদিকে তাঁবু, ছাপ্পর, প্যাকিংকেস, রাইফেল, গোলা গুলির বাক্স, ছাপাখানা, আস্তাবল, হাসপাতাল, টিনের খাবার, তাজা খাবার, ঔষধ-চেস্ট, ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ, আমবুল্যান্স, বিউগল, নিশান, বর্শা, তলোয়ার, ইত্যাদির টাল লেগে আছে। একা এই ক্যাম্পেতেই ছিল সাত শ খচ্চর, ভারবাহক ঘোড়া, বলদ ইত্যাদি।

নেতাজী বলতেন, এসব কিছুই আবশ্যক হয় না যদি প্রাণে বৃটিশ বিদ্বেষ তেজ থাকে। হিরণ্যকশিপুকে কেবল নখ করেই চেরা হয়েছিল, পুতনা দাঁতের কামড়েই সাবাড়। বন্দুকের কি দরকার? নেতাজী রহস্যও বেশ করতেন।

নেতাজী দয়ার সাগর ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভালবাসতো, ভক্তি করতো, নিজের কর্তব্য সমাপন করে তাঁকে খুশী করবার জন্য ব্যস্ত। তাঁর কখনো ধমক দেবার, সাজা দেবার আবশ্যক হ'ত না। তিনি নেতা, কর্ত্তা ছিলেন কি পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ছিলেন আমরা আজ অবধি জানি না।

শত শত ছাগল ভেড়া ছিল। ঝটকা বা হালালে কেউ আপত্তি করতো না। বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর খাদ্য জোগাড় করবার নেতাজীর আশ্চর্য নিপুণতা ছিল। তাঁর তত্ত্বাবধানে চুরি বলে কোন কথাই ছিল না।

সকল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গলগ্রহ বিস্তর থাকে, স্ট্র্যাগলার, হ্যাংগার অন, ক্যাম্প ফলোয়ার, ভাগ-পাড়াউআ, মেয়ে-পুরুষ ছেলে, মৃত্যুভয়শূন্য আহত, রবাহূত, ফ্রি-ফুডার। আজাদ হিন্দ ফৌজে এরা তো ছিলই, তা ছাড়া ব্রিটিশ ও আমেরিকান গোটাকতক লোক পাতের ডাল ভাত খেতো ও মুটে মজুরের মত খাটত। তারা হাফ বন্দী হাফ বন্ধু।

নেতাজী যদি আজ দেশে থাকতেন তা হলে কি এক সের পাঁচ ছটাক খুঁকড়ি চালের জন্য সাত দিন অন্তর ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে লাইনে দাঁড়াতে হয়?

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন কি কেবল মিউটিনিয়ার এবং ডেজারটার নিয়ে? তা নয়। দলে দলে শিক্ষিত অশিক্ষিত পুরুষ নারী এসে দল পুরু করলো। চটপট ট্রেনিং হ'য়ে গেল। বাঙ্গালী দুটি ঘোমটা দেওয়া বউ পরদা ছেড়ে এক মাসে ঘোড়ায় চ'ড়ে কমাণ্ড করতে লাগলো। আশ্চর্য! কি ক'রে এত দূর থেকে ঐ অজানা জঙ্গলে লোক ভর্তি হতে গেল! কোনো দেশের লোক আসতে বাকি ছিল না, কেউই শত্রুতা করে নি যারা এসেছিল। ভারতীয়, বরমিজ, নেপালী গিসগিস করতো। কোনও না কোনও সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

যোদ্ধা না হয়ে যে আর কেউ এমন সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করতে পারে এরকম কেবল আর একটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখতে পাই। মহাকবি বায়রন গ্রীসকে তুরকীর দাসত্বশৃঙ্খল হতে স্বাধীন করবেন বলে গ্রীক সৈন্যবাহিনীকে ভীষণ সাজে সাজিয়েছিলেন এবং সেনাপতি হয়েছিলেন।

এ কথা বোলো না যে ১৮৫৭ সালে এইরকম ইংরেজ তাড়াবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিসে আর কিসে! তাতে কি ইংরেজ ভয় খেয়েছিল না এ দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল? ইংরেজ দস্তুরমত লড়েছিল, জিতেছিল, প্রতিশোধ নিয়েছিল, ফাঁসি ঝুলিয়েছিল। ভারতের সৈন্য-বাহিনী দেখে ল্যাজ গুটিয়ে এরকম কবে পালিয়েছিল কি?

নেতাজীর এই বৃহৎ সৈন্যবাহিনী দেখে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা দিয়ে, ক্যাশ বাক্সের চাবি ফেলে ইংরেজ দে দৌড়। ভাবলো, হেরে মরবো যুদ্ধে বাঙ্গালী নেতার কাছে? সব পল্টনই তো তাঁর দিকে ঝুঁকবে।

নেতাজী আমাকে বললেন, "চলো লাঘাটে! বাহার!"

চন্দ্রমা টিপু সাঁহেবকে কোলে নিয়ে ঘোড়ায় সোয়ার হলেন। :নং ক্যাম্পে অন্ধকারেই চললেন। এপথে গোরারা প্রায়ই লুকিয়ে থাকত। ধন্য নেতাজীর শিক্ষা, ধন্য তাঁর সাহস দান। মেয়ে-পুরুষ এই রকম অন্ধকারেতেই স্বাধীনতার পথ চিনে নিল এত দিনে। কোথা গেল জুজুর ভয়? "ঐ গোরা, ঐ টমি, ধরলে রৈ", সে বুলি গেল কোথা? আজাদ হিন্দ ফৌজ তা বিলুপ্ত করেছে। মনের আবেগে আমার ও নেতাজীর বক্ষ স্ফীত হ'ল।

চন্দ্রমার হাতে সেকেলে পুরানো—মরচে-ধরা ৬-ইঞ্চি ব্যারালের ছ-চেম্বার রিভলভার মাত্র ছিল। নেতাজী জানতেন তাঁর যুদ্ধ সরঞ্জাম খুব উঁচু দরের ছিল না, তাই বলতেন, "আমি যদি অপারগ হই, তা হলেও আমার উদাহরণ ভারতকে উত্তেজিত রাখবে।" তলোয়ারের উপর হাত রেখে দাঁড়াতেন, আবার ক্ষণেক পরে হাতের উপর হাত বক্ষে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে স্থির চিত্তে "জেন. লাঘাটে!" বলে কি ভাবতেন। আমি চুপ করে অপেক্ষা করতাম।

টিপু সাহেব পিট পিট করে তাকাতে তাকাতে চলল। হয়তো বুঝেছিল এই পথে তাকে কাল কি একটা অসমসাহসিক কাণ্ড করতে হবে, বা প্রাণ দিতে হবে। টিপু অতি হুঁশিয়ার কিন্তু।

হুঁশিয়ার পায়রা ঘনপত্রাবৃত বৃক্ষদলের ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময় সাবধানে যায়, উর্ধ্বে উঠলে পাছে বাজ পাখি আক্রমণ করে। নেতাজী আমাকে বলতেন, "জেনর‍্যাল লাঘাটে সাহেব!" কবতরসে মেরা দিল ছবি হুই হায়!"

জোন্‌স আণ্টি-হক সাইরেন টুথ-পিকের সাইজ মাত্র। নেতাজীর

কবুতররা এতেও সজ্জিত হ'ত। 'টিপু', 'নানা', 'মেঘদূত' এই তিন পায়রা নেতাজীর কাছে "হিক্‌স্ ফ্রেঞ্চ মেথডে" শিক্ষা পেয়েছিল। এই শিক্ষা পেলে পায়রা কুইল সমেত চিঠি গিলে ফেলে—যখন দেখে ধরা পড়ছি। পেট কেটে শত্রু খবর বের করে। কোন কারণে কবুতর অজ্ঞান হয়ে গেলে চিঠি গিলতে পারে না।

তার পর দিন ভোরে ১নং ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন চন্দ্রমা গুপ্তচরের মুখে খবর পেলেন যে "ডিব্রুগড় কনটিনজেণ্ট ইস তরফ নেই আওয়েগা"। পেঁয়াজের ছালের মত (অনিয়ন স্কিন) পাতলা কাগজে হিন্দিতে এই বহুমূল্য সংবাদ লিখে কুইলের ভিতর সরু করে পুরে দিলেন। কুইল টিপুর বাঁ পায়ে বাঁধলেন। ডান পায়ে বাধলেন হিক্‌স অ্যাণ্ড সিলার্স সাইরেন। জঙ্গলী বাজপাখি এই ফকন ফ্রাইটনারের বিকট আওয়াজে ভয়ে পালায়, পায়রাকে খেতে পারে না। এই বাঁশি-গুলোর দোষও আছে। শত্রু জানতে পেরে গুলি করে পায়রা মারে ও সংবাদ হস্তগত করে। ওস্তাদ কোড ওয়ার্ডও পড়ে ফেলে।

চন্দ্রমা দুই হাতে পায়রাটাকে ধ'রে দরজার কাছে এলেন। বড় বড় অফিসাররা তামাশা দেখবেন। এই ক্যাম্পের কর্নেল-কমানডাণ্ট ছিলেন সর্দার বসওয়া সিং—তিনি বললেন, "এক, দো, তিন!" চন্দ্রমা পায়রা ছাড়লেন।

যেন একটা হাউই চোঁং করে আকাশের গহ্বরে প্রবেশ করল। টিপু সাহেব দুবার মাত্র পালক নেড়েছিল, তার পর কম্পনশূন্য দুগ্ধফেননিভ পক্ষ বিস্তার, প্রচণ্ড বেগ, উর্ধ্বগামী দেহ ও হাওয়া পেয়ে সাইরেনের বিকট চিৎকার। এত সরু বাঁশী কি করে এমন শব্দ করে? শব্দতেই বোঝা গেল কি ভীষণ স্পিড টিপুর। ১নং

টনচিন ক্যাম্প থেকে ডোংরা ক্যাম্প মাত্র ছ মাইল। সাতটায় টিপু রওনা হ'ল, ধীরে সোজা গেলে ছয় মিনিটে পৌঁছুবার কথা। পায়রার বংশগত কৌলীন্য, শিক্ষা, ও হাওয়া অনুসারে গতি কমে বাড়ে, বার্তাবহ পায়রা প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঘুর পথ দিয়ে প্রায়ই যায়। সিবাগোপোলে পায়রার গতি হয়েছিল এক মিনিটে তিন মাইল পাঁচ ফরলং। সব দিক হিসাব করে বাজ হ'তে বাঁচার ফিকির সুদ্ধ নেতাজীর কাছে টিপুর সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছুবার কথা। মানুষ অপেক্ষা জঙ্গলী বাজ বেশী শত্রু। বাঁশি না থাকলে মৃত্যু নিশ্চয় ঘটবে, আকাশেতেই।

এই অঞ্চল জাপানী অধিকৃত হলেও স্থানে স্থানে ইংরেজ পিকেট লুকিয়ে থাকত। লুকোচুরি খেলা চলত। সোজা পাঁচ মাইল উড়লে টিপু লুফং বনে পৌঁছুবে। এখানে বেজায় ইংরেজ শত্রুর ভয়। বৃটিশ স্পাইরা নেতাজীর খোঁজের জন্য ঘুরে বেড়ায়। সেই জন্য নেতাজীর এক গুপ্তচর, যে গোরাদের কটমট ভাষা বোঝে, এই বনে এক গাছের উপর পকেটে কম্প্রেসড ফুড টাবলেট নিয়ে বসে থাকে। সে দু দিন পরে আমাদের কাছে ফিরে এসে গাছের উপর বসে যে হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখেছিল তা বর্ণন করলে। আমি এখন সেটা এখানে বলব। মনে মনে অহংকার হচ্ছে যে নেতাজী আমাকে বলতেন, "জেনারল লাঘাটে! তোমার গল্প যেন দ্রুতপদ রেস হর্সের মতন ছোটে. তোমার বর্ণনার উগ্রতা আমাকে চঞ্চল করে!" হায়! যদি মন্ত্রবলে বেঁচে উঠে আমার এই কাহিনী শোনেন!

সার্জন-ক্যাপটেন ব্রাউন (মিলিটারী ভেট) দু জন বৃটিশ সোলজার নিয়ে লুফং জঙ্গলে হারানো খচ্চর খুঁজতে এসেছেন। কণ্ঠলম্বিত সার্জিকেল

অস্ত্রপূর্ণ ব্যাগ, কোমরে ইনজেকশন তোড়জোড়, পকেট ব্যাণ্ডেজ ও অ্যাবজরবেণ্ট তুলো। সঙ্গে খচ্চর কোরের উর্দি। খচরামিতেও পটু।

হঠাৎ একজন গোরা চেঁচিয়ে বললে, "গিলি, দি স্কাই স্পিকস্!" উপরে শোঁ শোঁ করে বিকট শব্দ শোনা গেল। এই আকাশবাণী টিপুর সাইরেনের।

"গো ইট, টিম!" গিলি বললে। টিম রাইফল তুলে আকাশে গুড়ুম করে ফায়ার করল।

গুলি লাগলো না, কিন্তু টিপু অজ্ঞান হয়ে আকাশ থেকে পড়তে লাগল। মেঘের ডাকে চিল, কাকও এই রকম পড়ে ও খানিক পরে উড়ে পালায়।

টিম বললে, "ক্যাচ দি বল অ্যাণ্ড ফেচ ইট ইন।" গিলি আকাশ থেকে যেন একটা টেনিস বল দুই হাতে লুফে ধরল,—অতি সুন্দর সাদা ধপধপে পালকের তাল।

ভেট-সার্জন সাইরেনটি খুলে পকেটে পুরলেন। কুইল থেকে চিঠি টেনে নিয়ে হিন্দি লেখা দেখে রেগে চার টুকরা করে ঘাসের উপর ছুড়ে ফেললেন। টিপুর সে সময় চেতনা ফিরে আসছে প্রায়। সার্জন সাহেব ব্যাগ থেকে চকচকে কাঁচি বের করে বললেন, "তোকে প্রাণে মারবো না, কিন্তু নেতাজীর কাজও করতে দেব না।" নিষ্ঠুর নরপিশাচ কচকচ করে টিপুর পালকগুলো কেটে দিয়ে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিল। এই লোকগুলো নেতাজীকে "Naughty Jay" বলত।

তিনজনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হল, পাছে জাপানী বা নেতাজীর লোক গুলি করে। পলায়ন-পরায়ণ হাট কোটের ভিতর কত কাপুরুষতাই লুকানো থাকে!

ভেটের বোধ হয় হঠাৎ আক্কেল হল। চিঠি কোথায়? "পিজন-গ্রাম" ছেঁড়বার অধিকার আছে? হেডকোয়াটার্সে কি কৈফিয়ত দেবে? তাই সে আবার দেখা দিল।

চার টুকরা চিঠি, অনেক খুঁজল, পাওয়া গেল না। কোথায় হাওয়ায় উড়ে গেছে, পায়রাটাও নেই। তাকে হয়তো শকুনী ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। বোধ হয় "ভেট" সাহেব বুঝেছিল যে রাগের বশে ভুল করেছে। কোর্ট মার্শাল না হয়।

ডোংরা জঙ্গলে নানা ধ্বনি মুখরিত ২নং বৃহৎ ক্যাম্প পায়রাটার সংবাদের জন্য বড়ই উৎসুক। কাঠের তৈয়ারী অফিস ঘরে নেতাজী বড় বড় যোদ্ধাদের সঙ্গে বসে আছেন। সভা গম গম করছে। কাবুলী ভক্‌সা খাঁও সেখানে ছিল। সে বাজপাখীর দ্বারা শিকারে নিপুণ। নেতাজীর এই ক্যাম্পে দশটি শিক্ষিত বাজ ভক্‌সার অধীনে আছে। নেতাজী নিজেও টালিগঞ্জের ফক্‌ন অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার ছিলেন। বহুমূল্য ক্যারিয়ার পায়রা হারালে এই কাবুলী ওস্তাদ তার শিক্‌রে ছাড়ে। 'শিকরে' হারানো পায়রা দুই পায়ে ধরে জীবন্ত 'টস অপ' ক'রে আনে। কখনও বা মেরে ফেলে।

নেতাজী ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। সাড়ে সাত হয়ে গেছে। সাড়ে আটটাও বাজে। আমাকে আমার ইউ. পি ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, "লাঘাটে, তুম ঠিক দেখা থা ভাইয়া, একঠো পানা-গড় একঠো ডিব্রুগড় কবুতর আশমান মে আজ?"

আমি উত্তর দিলাম, আমেরিকান হেণ্ডারসনস্ হক-হুটার পানা-গড়ে, এবং ইং হিউএট্‌স হুইস্‌ল ডিব্রুগড়ে ব্যবহার হয়। আমি আজ সকালে দুটোই শুনেছি ও সনাক্ত করেছি। পায়রা দেখি নি।

"অংরেজোঁকো ফৌজ খবর ভেজতা থা মালুম। নিচে পল্টন গরজেঁ, উপর আশমান বোলেঁ।"

কণ্ঠস্বর খুব উচ্চ করা বারণ ছিল। এমন ধ্বনি বারণ ছিল না যা আধ মাইলের ভিতর বদ্ধ থাকে। মিউল "ডিভয়েস" করা ছিল। তাদের 'হুইনি' (হ্রেষা) শত্রুকে জানতে দিতে পারত না কোথায় নেতাজীর ক্যাম্প।

নেতাজী বললেন, "হয়তো ইংরেজ সোলজার দেখে টিপু সাহেব কোন গাছে লুকিয়ে বসে আছে। অথবা বেইমানটা ইংরেজের দুটো পায়রার সঙ্গে ভাব করে বসে আছে।"

"হাঁ মিল গিয়া তিনো শয়তান," আমি বললাম।

জেন. মাগুক সাহেব এসে বললেন, "দুরবীন দিয়ে সমস্ত আকাশ চষে ফেলেছি,—টিপু হাওয়া হো গয়া।"

আমি বললাম, "নেতাজী, দরখ কো টেহনি পর পক্ষেড় কি ঘোশলে মে তিন কবুতর দাওয়ত করতা হোগা।" তিন পায়রার গাছের উপর নীড়ে বনভোজন সম্ভব বুঝে নেতাজীর সেক্রেটারী নীলাভ-চক্ষু জার্মন স্ট্র্যাফার সাহেব হেসে বললেন, "ড্রাইবুন্ড!" তাঁর হলুদমাখা জাপানী সেক্রেটারী অসীমো সাহেবও কিছু বুঝে বললেন, "উম্পে সেনন!" সাইকলজিস্টরা বলেন, "ভাষা না বোঝার একটা আনন্দ আছে।" এ আনন্দ আমরা রোজ উপভোগ করতাম। সম্পাদক ক্যাপ্টেন আলি আহমদ বললেন, "ইয়া উল্লুকে পাঠ্ঠা অংরেজোঁকি কবুতর দোনো কো খানা দিয়া, ইয়া কিস্সা কাল যাদনার হেডলাইন কো সাথ মেরা আজাদ হিন্দ্ ফজি আক্বর মে ছাপেঙ্গে।" নেতাজীর দৈনিক কাগজ রোমান টাইপে হিন্দুস্থানী ভাষায়

বার হত। আফিসের বাইরে অস্ফুট উত্তেজক সৈন্যগুঞ্জন, নেতাজীর প্রাণে বোধ মনে হয় হচ্ছিল যেন মদমত্ত মধুকর নিকর মধুময় মধূৎসব করছে। বীরের এই স্বভাব। নেপোলিয়নের অসটারলিট্‌-জের কামানগর্জন কর্কশ না মুরারির মুরলীধ্বনি বোধ হয়েছিল? এই অসাধারণ তেজস্বী ভারতের পুত্রকে সকল দেশেই এশিয়ার নেপোলিয়ন বলে থাকে। বিপদে শান্তিতে সুখে ও দুঃখে নেপোলিয়নের মত নেতাজী অচঞ্চল থাকতেন।

নেতাজী আমাকে বললেন, "জেন লাঘাটে, আরো আধ ঘণ্টা দেখি, নয়টা পর্যন্ত।" সে সময়ও অতিবাহিত হল, কই, মাচার ঘণ্টা তো বাজল না? নেতাজীর চিন্তায় আমরা সকলেই চিন্তিত।

সাড়ে নটাও হল। উদ্বেগের পরিসীমা নেই। ভকসা খাঁ বাজ ছাড়তে উদ্যত। হাতের উপর চামড়া পেতে সেই ঝাঁসি রানী রেজিমেণ্টের বিখ্যাত পক্ষিণী 'গুন্না'কে বসিয়ে এনে উপস্থিত। বক্র যমায়ুধ চঞ্চু, চক্ষে শ্যেন-কটাক্ষ, পদপল্লবের অঙ্গুলি শূর্পণখা, ক্রোধ-ক্রূর ক্রীড়ায় ক্রিয়াশীল, আহার কাঁচা গো-মাংস, পানীয় তাড়ি বা ধান্যেশ্বরী। কাবুলী জিজ্ঞাসা করল, "ডেঢ় বুমো?" নেতাজী পুশ্‌তুতে উত্তর দিলেন, "খুনো শুনবো খুন ডিংলেডি।" সাড়ে নয় বাজল।

হঠাৎ দরজায় গুণ-ছুঁচ ঠোকার শব্দ হল। এত সাহস কার যে এটিকেট অনুযায়ী ট্যাপ না করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতার দরজায় গুণ-ছুঁচ ঠুকবে? ইয়ারকি নাকি? আমি গর্জন করলাম, "কোন্ দিল্লগিবাজ লওণ্ডা হ্যায় রে! তুমকো কয়েদখানামে ভর দুঙ্গা।" ষ্ট্যাগলার ছোঁড়া বিস্তর ঘুরে বেড়াত। তার মধ্যে একটা ইংরেজ ছোঁড়াও থাকত। সে ভীষণ বদমাশ। তার নাম শর্টি। সে তাঁবুতে ঢুকে সিগারেট চাইত।

নেতাজীর ছেলেদের ব্যঙ্গ শুনবার অবকাশ কোথা? ইস্কুল ও চিনাটিজের ভীষণ সংঘর্ষ হয়ত নিকটবর্তী। ঘন ঘন "দেহলি চলো" গর্জন রেগুলেশন কণ্ঠস্বরের মধ্যে দাবিয়ে রাখা ভার। সেই নরমুণ্ড-মালিনী করালবদনীর মনে কি আছে কে জানে।

আবার গুণছুঁচ ঠোকার আওয়াজ "ঠুক ঠুক ঠুক!" সিংহের মত লাফিয়ে নেতাজী দরজায় গেলেন। হ্যাণ্ডেলে ভীষণ হ্যাঁচকা টান দিলেন।

দরজা সশব্দে খুলে গেল। কোথায় সাহেব ছোঁড়া শর্টি? নেতাজী ও আমি অবাক হয়ে দেখলাম চৌকাঠের কাছে প্রভুভক্ত পালককাটা হতভাগ্য টিপু সাহেব মুখে চার টুকরা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সে-ই ঠোঁট দিয়ে দরজায় আঘাত করছিল। বেচারী ঠোঁটে চার টুকরা কাগজ তুলে নিয়ে এক মাইল বন্য পথ প্রায় দুই ঘণ্টায় হেঁটে এসেছে।

চিঠির টুকরাগুলি নেতাজীর পদপ্রান্তে রেখে, তার পকেটের দিকে তাকিয়ে মটর খাবে বলে করুণ আবদার করতে লাগল, "বক্ বক্ বকোম! বক্ বক্ বকোম।"

১৩৬০

নেপালী খাসি

কিসের একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। পশ্চিমে হাওয়া। বাঘ-বাঘ চিংড়ি-চিংড়ি সৌরভ। দত্ত বলল, 'জান না বড় মামা, খাঁ-সাহেবের মেয়ের বিয়েতে আঠারটা নেপালী খাসি এসেছে, তার সিক কাবাব, কোর্মা, কোফতা, গ্রিল, পোলাও হবে।'

নেপালী খাসি দেখতে রেল লাইনের ধারে খাঁ-সাহেবের বাগানে গেলাম। যেন আঠারটা ঘোড়া বাঁধা আছে বোধ হল। আমাদের দেখে সামনেকার খাসিটা শিং ঘুরিয়ে রোখ করে পিছুদিকের দু ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে উচ্চনাদে ঊর্ধ্বনেত্রে 'ব, ব!' ডাকল, তার পিছনে দন্তকারী আরও গোটাকতক 'ব, ব!' শব্দে যুদ্ধ করতে দড়ি সমেত লাফাল। বাংলা বিহার ইউ-পি খাসির মতন নেপালী খাসি 'ব্যা ব্যা' করে না। মাত্র একবার দু বার 'ব।' বলে, তাতে আকার ওকার অ্যা-কার নেই। নেপালী খাসি মুখ উঁচু করেই থাকে, যেন জিরাফ, মস্ত দাড়ি ঝোলে বুক পর্যন্ত। খাসির দাঁড়ি গোঁফ হয় না এ ধারণা ভুল। আমি আর দত্ত নেহাৎ ছেলেমানুষ। দত্ত পাকা বৈষ্ণবের ছেলে, আমি মৈথিল, বাঙ্গালী ও উড়িয়া ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না ছাড়া খাই নি; কিন্তু জাত সম্বন্ধে আমার যা শিক্ষা হয়েছিল দুর্দম বেগবতী সিককাবাবের আকাঙ্ক্ষা তার পক্ষচ্ছেদ করল।

খাঁ-সাহেব ধনী লোক, টুক্‌রা টুক্‌রা বাংলা বাগান ঘেরা তাঁর বাসস্থান, আমাদের সঙ্গে খুব ভাব এবং যাতায়াত ছিল। একা, পালকি,

'মাস্কউলী' গাড়ী ছিল। অতি দামী পোশাক পরতেন; মুখে সটকা ও হাসি লেগেই আছে। তাঁর লখনউ এবং হায়দ্রাবাদের শিক্ষিত পাচক রান্না করতো। নেপালী খাসি রান্নার জন্য বাড়ীতে কারিগর লাহোর থেকে এসেছে। কলকাতা থেকে রান্নার মসলা এসেছে, 'পাতথর-কা ফুল, দারচিনিকা-ফুল, শা-জিরা, চিলগোজা, বনফসা' ইত্যাদি। তিনি আমার বাবাকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন, আর সব অন্যান্য গণ্য-মান্য বাঙ্গালীকেও সাদর আহ্বান করলেন। দত্ত বলল, 'মামা গো! এ খাসি যদি না খেতে পাই তবে এ প্রাণ রাখবো না।' বললাম, 'আমারও রুই কাতলায় বিতৃষ্ণা!'

এটা জানা কথা যে বাঙ্গালীরা কেউ খাবে না, সভায় নাচ দেখে আতর গোলাপ মেখে চলে আসবে। আমি আমার বাবার, দত্ত তার বাপের প্রতিনিধি হয়ে বিয়ে বাড়ি যাব। বাবা সাবধান করলেন 'ছাখ! যেন শরবৎ খাস নি, কেবল একটু আতর ছুঁয়ে দুটো ছোট এলাচ হাতে নিবি, বুঝেছিস!'.

দশরথের সময় থেকেই সকল বাপ মনে করেন ছেলে আমার আজ্ঞা পালন করবে, আমার সত্য বজায় রাখবে। তাঁরা ভাবেন না যে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির এবং বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ ইত্যাদি ঋষিরা ষণ্ড মাংস শূলপক্ক করে খেতেন। জানবেন কোথা থেকে, এ সংবাদ নূতন রামায়ণ মহাভারতে হালে বাংলা ভাষায় বেরিয়েছে। 'এডুকেশন ইজ স্লো ইন বেঙ্গল' লর্ড রিপন বলেছিলেন।

খাঁ-সাহেবের কাছে দিনের বেলা আমি এবং দত্ত চুপি চুপি গিয়ে বলে এলাম, 'খাঁ সাহেব, দো আদমী ছিপায়কে খাওয়েঙ্গে।' মহানন্দে তিনি বললেন, 'জরুর-জরুর জরুর। খানগী কামরা বন্দোবস্ত হোগা।'

শামিয়ানার মধ্যে নানারকম সুবাস উড়ে বেড়াচ্ছে, আতর গোলাপ চামেলী বেলা, পেঁয়াজ, রসুন, জাফরান আর নর্তকীর সংগীতের মৃদুস্বর 'মারি মেরি বৈঁইয়া!' বাঙ্গালীরা চমৎকৃত হয়ে বসে আছেন, কি জানি কার মনে কি ভোজনসুখের চিন্তা উদয় হচ্ছিল। বাঙ্গালীরা ক্রমে সকলেই সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন, কেবল সন্দিগ্ধ চিন্তামণি বোস একটু দেরিতে গেলেন; জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে, 'বাড়ি যাবিনে? পিচেশের মতন বসে কেন?' বললাম, 'বাজি পোড়া দেখে যাব।' এঁকে আমরা ভয় করতাম না বটে, তবে জানা ছিল ইনি কড়া লোক, এক বাঙ্গালী মোক্তারকে জাতের বার করেছিলেন। দত্ত চিন্তামণিকে দেখা দেয় নি, এক পাশে লুকিয়েছিল।

একটি মাঝারি কামরায় চারিদিকে চার দরজায় পরদা ফেলে তক্তার ফরাসের উপর কাঁচের প্লেটখানা দেওয়া হল। কেবল দত্ত ও আমি দু জন খেতে বসলাম। আমাকে যিনি উর্দু পড়াতেন তিনিই এই পরিবেষণের তদারক করতে লাগলেন। বাবা তাঁকে ১৫৲ মাইনে দিতেন, আর যিনি সংস্কৃত পড়াতেন তাঁকে ২০৲ দিতেন। ইনিই হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত শ্যামাদৎ চৌবে, গোঁড়া ও বদরাগী। বাপরা মনে করেন ছেলে সর্ব শাস্ত্রে বিদ্বান হোক, কিন্তু ক্ষুদ্র বালক ঠিক করতে পারে না উর্দুর সিক কাবাব খাই কি গোঁড়াদের সংস্কৃত কাঁচকলা ভাতে খাই। পর্দা তুলে মাঝে মাঝে দুই একজন অবাঙ্গালী উঁকি মেরে দেখে গেল দুটো বাঙ্গালী কেমন খাসি খাচ্ছে। কোনও ডিটেকটিভ বলে বোধ হ'ল না।

সাদা ধপ ধপে মনোমোহন পোলাও এল, তার মধ্যে বর্ণহীন ভুমো ভুমো হাড়ে মাসে নেপালী খাসি, কিসমিসের সম্ভার। আনন্দে

আমাদের টিকি পারপেনডিকুলার! কি সুন্দর স্বাদ! তার পর হলদে পোলাও, বাঙ্গালীর হলুদে রং করা নয়, হরশিঙ্গার (শিউলি) ফুলের বোঁটা শুকনো করে তার রং দেওয়া। তাতে বড় বড় টুকরা ব্রাউন রঙের নেপালী খাসি,—তাতে 'চিল গোজার' শ্রাদ্ধ, বাদামের বদলে,—কেতকী ও পাত্থরকা ফুলের সুবাস। সিক কাবাবের সঙ্গে পোস্তভরা রুটি, টিকিয়া কাবাব। গ্রিল, স্নেক-স্কিন কাবাব, অর্থাৎ বাঙ্গালীর সরুচাকলির মত পাতলা নেপালী খাসির কিমা আড়াই-ইঞ্চি জি, আই, পাইপের ওপর রোস্ট করা! অথবা কড়াই চাঁচা দুধের শুকনো সরের মতন পাতলা, হিন্দিতে যাকে 'খখরনী' বলে।

দিল্লীর পেস্তার বরফী, ফিরনি, গুলাবজামুন, পেশোয়ারী কুমড়ার মোরব্বা আমরা ছুঁলাম না—আমাদের মিষ্টান্নে অরুচি! কেবল 'খাসি খাসি' মন।

তার পর দিন মর্নিংওয়াকে দেখা হ'ল কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁরা সকলেই আমাকে দেখে গম্ভীর হলেন, একজন বললেন 'তোমার নামে ভীষণ বদনাম শুনছি! তুমি নাকি কাল রাত্রে আর এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে নেপালী খাসি খেয়েছ?

অবাক হলাম! কি করে রটে গেল? গোয়েন্দা তো কেউ ছিল না; তবে কি চিন্তামণি বোস সন্দেহে রটিয়েছেন! কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা কি করে রটাবেন?

তার মধ্যে একজন ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার বাবাকে আমরা সব বলে দেব, কিন্তু তাঁর আগে তোমাকে একবার চিন্তামণির কাছে নিয়ে যাব, তিনি-ই হবেন প্রধান বিচারপতি, চলো!

'আজ তো হবে না!' আর একজন বললেন, 'চিন্তামণির শেষ রাত্রি থেকে কলেরার মতন হয়েছে, একটু ভাল হলে তোমাকে যেতে হবে। আসিসটেণ্ট হেডমাষ্টারও থাকবেন।'

শীঘ্রই চিন্তামণি ভাল হয়ে উঠলেন। বাঙ্গালী এক দলের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, শুনলাম আমাকে জাতের বার করবেন। যে রাস্তায় বেড়াই বাঙ্গালীরা বলে, 'কি খেয়েছিলি? জাত যাবে হুঁশ নেই?'

মিথিলার এই বিখ্যাত শহরে বাঙ্গালী মাত্রেই চিন্তামণি বোসের জাতধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করতেন! তাই তাঁর দেমাকও হয়েছিল একটা ক্ষুদ্র স্কুলের ছেলেকে কি করে জাতের বার করবেন সেই ভাবনা তাঁকে উন্মাদ করল। আমার বিপদ হয়তো সম্মুখে, সাবধান হওয়া উচিত, কখন কি উৎপাত করবেন। আমি ভয় খাই নি তবে সামান্য উৎকণ্ঠিত হলাম। আমি মনে মনে ফন্দি খাটাতে লাগলাম বাবাকে বলে দেবার আগেই প্রতিশোধ নেব। আমি তো মুরগী খাই নি, তবে জাত যাবে কেন?

যদি এ ঘটনায় না পড়তাম তা হলে শরৎ চাটুজ্যের 'বামুনের মেয়ে'র যে রাসমণি লোককে 'জাত, ধর্ম, শাস্তর' শিক্ষা দেন ও সাজা দেন তা বিশ্বাস করতাম না! মনে করতাম ঔপন্যাসিক গ্রাম্য বিচার-আচার অতিরঞ্জিত করছেন। শহরে ইংরেজী শিক্ষিত যবনের বিস্কুট পাউরুটি বরফ খেকো অফিসের চাকুরে পুরুষের যদি এই হাল তবে পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকদের দোষ কি। তখন হণ্টলি-পামার্সের বিস্কুট বাঙ্গালী বাড়ি ঢুকেছে, দাম ২।০, ডাক বাংলার নিকলে সাহেবের পাউরুটিও সকলে খাচ্ছে।

বাগানের একটা তেমাথা রাস্তায় 'নো থরোফেয়ার' সাইনবোর্ড

আছে। তার পরেই ম্যাজিস্ট্রেটের ‘বাংলা’, তার এ ধারে আমাদের। চিন্তামণি সেইখানে দাঁড়িয়ে আমাকে শাসন করছেন। বললেন, ‘তোর বাবাকে বলে দেব তুই অহিন্দুর বাড়ি নেপালি খাসি খেয়েছিস; শুনেছি তোর সঙ্গে আর একজন বাঙালী খেয়েছিল, তার নাম কি বল্, তাকেও জাতের বার করবো। কি কি খেয়েছিলি বল, দেখি পাপের মাত্রা তোর চরমে উঠেছে কি না।’

বললাম, ‘দু রকম পোলাও, নেপালী খাসির কাবাব, তার-ই কোরমা, রওগনজুস, গ্রিল, বোকতা, কারি দানে কি রোটি, পানি কি খিচড়ি—’

‘অ্যাঁ! অ্যাঁ! রাম রাম! তোকে আজই জাতের বার করবো,—আর কে তোর সঙ্গে একটা বাঙালা পিশাচ খানা খেয়েছিল বল বলছি!—তোর হেডমাষ্টারকে বলে দেব, তোর সংস্কৃত পণ্ডিত শ্যামদং চৌবেকে বলে বেত খাওয়াব—

এমন সময় বাবা একটা বাগানের ভেতর থেকে দেখা দিলেন, অনেক দূরে। চিন্তামণি বোস বললেন, ‘অফিস যেতে হবে এখন যাই, বিকেলে আবার ঠিক এইখানে আমার সঙ্গে দেখা করিস!’

চিন্তামণি বোস হন হন করে চলে গেলেন, বাবাকে তো কিছু বললেন না। সন্দেহ হল হয়তো বলবার সাহস নেই। তা হলে বেঁচে যাই, মিথিলায় কাউকে ভয় খাই না, বাবা ছাড়া।

চিন্তামণি যখন চলে গেল তার মাথার টিকিটা ঘোড়ার চাবুকের মতন বেঁকে ছিল। আমাদের সকলের মাথায় ৭০ বছর আগে লম্বা টিকি ছিল। মুরগী খেলে জাত যায় বিশ্বাস করতাম। নর্থ বিহারে এখনও টিকি খুব লম্বা। কলকাতায় অর্দ্ধেক বাঙালীর টিকি ছিল ৫০ বছর পূর্বেও। ট্রামে টিকির কি বাহার!

'জাতি নিপাত: 'এক ঘরে', 'হুকাপানি বন্ধ', তুচ্ছ কথা নয়; হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। একটি বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী সুরেন্দ্রনাথের কাছে প্রাণ রক্ষার জন্য বরিশাল থেকে এসে আছড়ে পড়লেন, 'মুদি চাল বেচে না! ধোপা কাপড় কাচে না, নাপিত কামায় না, গোয়ালা দুধ দেয় না, ষ্টিমার বুকিং অফিসে টিকিট দেয় না, ছেলে পিলে নিয়ে উপবাস করছি!' লিভারপুল নুন বেচতেন! ইংলণ্ডের মাল বয়কোটের জন্য নেপোলিয়ন আর সুরেন বাঁড়ুজ্যে জগৎ বিখ্যাত। তাঁদের হুকুম যে অমান্য করেছে জব্দ হয়েছে!

চিন্তামণির সঙ্গে আবার নির্জন রাস্তায় দেখা! বললেন, 'তোকে যে শাসন করছি এ কথা কাউকে বলিস না, তোর অনিষ্ট হবে।' এর-ই বা মানে কি? আমার বাবাকে লুকিয়ে কি আমাকে হায়রান করছেন? কিন্তু যতই শক্তিশালী শাস্ত্রবিৎ পিতা হ'ন সকল সময়ে পুত্রের 'হুকাপানি' বন্ধ হলে কিছুই করতে পারেন না এ কথা মোটামুটি আমার জানা ছিল, তাতেও আমার ভয় হয় নি, একটু ভাবনা মাত্র হ'ল।

চিন্তামণি জাত খাওয়ার মোড়ল হলেও আমার বাবা বাঙ্গালী সমাজের 'হেড' ছিলেন! তিনি এক এনজিনিয়ারকে জাতে তুলেছিলেন। শহরের সমস্ত বাঙ্গালী আমাদের কম্পাউণ্ডে জমা হলেন! এনজিনিয়ার গড় হয়ে প্রণাম করল। তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে আমার বাবা বললেন, 'বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে সৌজন্যে তুমি আমাদের সমকক্ষ; উঠ অমুক!' ভারি ইনটারেষ্টিং প্রথা, জাতে তোলা, জাত খাওয়া। একটি বিলেত ফেরত ছেলে জাতে রি-অ্যাডমিসন পেল তার বাপের সামনে টোস্ট চা দিয়ে এক চামচ গোবর খেয়ে ও সাধুর কৌপীনস্পৃষ্ট জল পান করে।

চিন্তামণি বললেন, 'তুই আমার সঙ্গে কাল তেয়াথায় দেখা করিস সকালে আটটায়। আবার সাবধান করছি আমার কথা কাউকে বলিস্‌নে!' আমি অবাধ্য হলাম না। বললাম, 'হ্যাঁ আসবো, কাকেও বলব না।' তাতেও সন্তুষ্ট নন! তাঁর সেপাই একটা 'সিলড' চিঠি এনে দিল। লিখছেন:—'আমার কথা কাউকে বলো না—চিন্তামণি!' সেপাইয়ের হাতে উত্তর দিলাম, 'কাউকো বলবো না।'

সত্য ঘটনা নিয়ে গল্প লিখলে 'প্লট' 'প্লট' করে ভাবতে হয় না। প্লট ঘটেই গেছে, সেইগুলো যথাস্থানে বসিয়ে দিন, দেখবেন—**truth is stranger than fiction.**

আমাদের বিখ্যাত হাই স্কুলে হাজার ছেলে free পড়তো। বছরে দশ টাকার বেত আসত। মিথিলার মাষ্টাররা মনের সাধে বাঙ্গালী ছেলেদের বেত লাগাত। কোন বাঙ্গালী ছেলে যদি কালীপূজার থিয়েটারে 'সতী নাটক' প্লেতে 'সতী' সাজত, তাহলে বাঙ্গালী জেগরাফির মাষ্টার এবং খোট্টা পণ্ডিতজী পাচনবাড়ি দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে মারত! খাসি খেলেও হয়তো এই সাজা হবে। ভাবলাম আমাকে চটপট ফিকির খাটাতে হবে।

পরদিন সকালে মর্নিংওয়াকে পণ্ডিতজীব সঙ্গে দেখা। 'প্র-ণা-ম পণ্ডিতজী!' বললাম। মুখ বেঁকিয়ে অভিমান সুরে বললেন—'তোহর পণ্ডিত কোন্ হৌ?'

আমি যেন অবাক হয়ে তিরহুতিয়ায় বললাম—'কথিলা?'

পণ্ডিতজী বললেন, 'এহন আদমী ভ কর বয়মানি করত ছ?'

পণ্ডিতের চোপা আর চাবুক ভয়ানক ছিল, তাঁর 'লট্-তি' আরো কর্কশ, আমাকে জেরবার করেছিল। তিনি বললেন যে হেডমাষ্টারের

কাছে খাসি 'ভচ্ছনের' রিপোর্ট পৌঁছে গেছে, তিনি তাঁকে বিচারের ভার দিয়েছেন। হেডমাষ্টার ইংরেজ, মোটা মাইনে, এবং রবিবারের গির্জার জন্য আমাদের পালেসিয়াল স্কুল বিল্ডিং সাজান! ম্যাজিস্ট্রেট, প্লানটার দল গির্জায় আসেন। কমিশনার অফ ডিভিসনও আসেন। খাসির সিক কাবাব তাঁর জুরিসডিকশনের বাইরে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে কুম্ভ দুর্ঘটনার খবর ভি আই. পি.-দের কানে পৌঁছতে বেজায় দেরি হয়েছিল। আমার নেপালী খাসি খাওয়ার খবর কত দ্রুত চারদিকে প্রতিধ্বনিত হল। প্রাণ যাওয়ার চেয়েও জাত যাওয়া বেশী বিপদ।

ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের কাছে একদল মাতব্বর বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা হল। দশটা কাক যেমন একটা খাঁচা-ছাড়া ইঁদুরকে ঠোকরাবার জন্য ঘেরাও করে, তাঁরা আমাকে তেমনি ঘিরলেন। একজন বললেন, 'তোমাকে জাতের বার করা হবে, মনে করো না তোমার বাবা রক্ষা করতে পারবেন! সেদিন বিয়ে বাড়িতে কি খেয়েছিলে? চিন্তামণির হাতে বিচার!' আমাকে একটু জর্জরিত দেখে তাঁরা বললেন শেষে, 'তবে তুমি যদি বল তোমার সঙ্গে আর একজন বাঙ্গালী নরাধম কে খেয়েছিল, তাহলে তোমাকে ছেলেমানুষ বলে মাপ করবো। তাকেই জাত থেকে সরাব!'

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় এক বিখ্যাত বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয় নি বিলেতফেরত বলে। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক গ্রাজুয়েট এক উকিলের মোটর চালাতেন বলে তাঁকে বিয়ের ভোজের পঙ্ক্তিতে বসানো হয় নি। গাড়ি চালালেই জাত যায়। আলাদা ঘরে ঠাঁই করে তাকে খাওয়ানো হয়েছিল। পশ্চিমে এক বিখ্যাত রাজার এম. আর. সি. পি. এস. খাটি ইংরেজ ঘোড়ার ডাক্তার লাট

সাহেবের ভোজে নিমন্ত্রণ পান নি।' চৌধুড়ি হাঁকাত বলে 'কোচম্যান' বলত নেটিভরা। মোটিভেও সাহেবের জাত মারে।

চিন্তামণিকে পরাজিত করবার এই এক অবকাশ, তাঁর সর্দারির উপযুক্ত সাজা হবে। বললাম 'হাঁ, তাঁর নাম বলতে রাজী আছি, তিনি চিন্তামণি বোস।—'

একটা কলরব উঠলো। এই আমার স্বযোগ, তাঁদের একজন বললেন, 'ও, তাই লোকটার সে রাত্রে কলেরা হয়েছিল, এত পাপ কি সহ্য হয়!' আর একজন বললেন, 'তাই বিগে বাড়ি থেকে আমাদের সঙ্গে কিছুতেই এল না!' আর একজন বললেন, 'দেখ, মিছে কথা বলছ না তো প্রমাণ কি?' আমি পকেট থেকে 'সিল্‌ড' চিঠি বের করলাম, তাঁকে দিলাম তিনি চেঁচিয়ে পড়লেন, 'আমার কথা কাউকে বলো না—চিন্তামণি।'

সকলে চীৎকার করে উঠলো, 'দেখছ একবার শয়তানি। আষ্টেপৃষ্ঠে সিল মোহর করছে, অফিসের একটা গোটা গালাই নেবড়ে দিয়েছে, তিন প্রমাণ পেলাম, দেরিতে বাড়ি ফেরা, কলেরা, আর এই চিঠি। এখন চললাম তার জাতের দফা রফা করতে।'

'প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা বলিবে, চুরি করিবে।' প্রখ্যাত গ্রন্থকারগণ মিথ্যা ও চুরির তারিফ করে গেছেন। কাঠুরিয়া যমকে শিক্ষা বলল, 'মাথায় বোঝাটা তুলে দেবার জন্য হুজুরকে ডেকেছি।' কপালকুণ্ডলা বলেছেন নবকুমারকে :—'চুপ! চুপ। আমি খড়্গ চুরি করিয়া রাখিয়াছি।'

চিন্তামণির বাড়িতে কি কাণ্ডকারখানা হল কে জানে। হয়তো মোড়লির মুকুট মাথা থেকে টেনে ফেলা হল। এই হীরকখচিত মুকুট আর কেউ পরবেন। সমাজের শিরোভাগে বসবেন। গোবর খাওয়াবেন।

পত্নীপ্রেম

আমার পরিচিত বয়স্ক ব্যক্তিদের, কলকাতায় ও পশ্চিমে, স্ত্রীর জীবনান্তে কারো কারো দেখছি ভীষণ মানসিক ব্যাধি হয়েছে। এ সাধারণ শোক নয়, কান্নাকাটি নয়। মহাভীতি, অদূরবর্তী অমঙ্গল, নানারকম খেয়াল দেখা দিল, সকলগুলোই তাঁরা নিজেই আমাকে বলেছেন যে পত্নীর প্রতি তাঁদের নিষ্ঠুর আচরণের সঙ্গে জড়িত। কুড়ি বছর স্ত্রী পরলোকে, কিন্তু স্বামীকে প্রতি রাত্রে স্বপ্নে দেখা দেন, রুগ্না বা বলিষ্ঠা, ক্রুদ্ধা বা হাস্যমুখী।

পত্নী বিয়োগের পর মহাত্মার মতন ব্যক্তিও অবিচলিত ছিলেন না; লম্বা প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেছিলেন কি কি ব্যবহারের জন্য তিনি অনুতপ্ত। এই মনখোলা প্রবন্ধ 'কাথারটিক' চিকিৎসার কাজ করলো। অর্থাৎ ফ্রয়েডের আগেকার মনোবিৎ ব্রয়ার প্রবর্তিত পথ অবলম্বন করলেন। খ্রীস্টানদের কন্‌ফেশনও একটা ভাল টোটকা।

যাঁরা মেণ্টাল স্পেশেলিস্টের চিকিৎসায় ছিলেন তাঁদের অনেকে ভালও হয়েছেন। একজন চিকিৎসার পূর্বে আমাকে বলেছিলেন, "কত অকথা কুকথা বলেছি তাকে, কত মনোকষ্ট দিয়েছি, নিষ্ঠুর ব্যাধের মতন ব্যবহার করেছি, কে জানে সে মরবে?"

ভুল! দাম্পত্য প্রেমে কোনও আচরণ নিষ্ঠুর হতে পারে না। পত্নীপ্রেম ও রাগ পাশাপাশি বাস করে। 'রাগ' মানে পণ্ডিতরা তাই প্রেমও বলেছেন।

ধরুন অমুক গ্রামে একটি আপনার অপরিচিত মেয়ে বা ছেলে আছে। তাকে আপনি ঘৃণাও করেন না ভালও বাসেন না। যেদিন

মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হ'ল, বা পুরুষটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল, ভালবাসা ও রাগ এক সঙ্গে এসে জুটল। হিংসা, অভিমান, বিচ্ছেদে কষ্ট সবই দেখা দিল।

ভালবাসা মানে অনুরাগ plus কলহ। সাহেবরা বলে, "all is fair in love and war"! লখনউয়ে মরদ আওরতের গল্প শুনেছি, "দিন মে গলে গলে, রাতমে বিল্লী বিল্লা মুসকতা" (স্বামী স্ত্রীর দিনে গলায় গলায় প্রণয়, রাত্রে বৈড়াল প্রবৃত্তি ম্যাও ম্যাও ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ) Byron বলেন :—

"Love's alternate joys and woe
Zui mousaz aga po!"

বিপত্নীক নিক্তিতে ওজন করে দেখেন, তার সঙ্গে কতখানি সদ্‌-ব্যবহার করেছি, কতখানি শয়তানি কপটতা করেছি। যেটাকে শয়তানি ভাবেন সেটাতে হয়তো স্ত্রীর ধর্ষিত হবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। সোশাল সায়েনসে বলে, স্ত্রী দাড়ি গোঁফবালা ডাকাতের মতন স্বামী চান, এবং কিয়ৎপরিমাণ নির্দয় আচরণে কপটতায় এবং তার প্রায়শ্চিত্তে আনন্দ পান। রাধিকা মহানন্দে গাইছেন :—

নিদয় কপট হরি!
দেহ চরণ ছাড়িয়ে।

ইংরেজীতে বলে, 'Lovers have words' (কলহ করে)। প্রেম কথার ভটচাজি। কথা শোনানো ও শোনা, কথা কাটাকাটি করা প্রেম। এক সেকেলে পত্নী স্বামীকে বলছেন, 'বলিতে দিয়াছে বিধি বল! বল! বল!' অর্থাৎ হৃদয়ের সমস্ত বাক্যভার ভাল বা মন্দ বৈবাহিক জীবন যাপন করতে করতে স্ত্রীর প্রাণে ঢেলে দিন, মিষ্টি,

তিক্ত, ঝাল, কষায়। একেই বলে দাম্পত্য প্রেম। যেমন বাজার ক্রে এনে পত্নীর পদপ্রান্তে থলে ঝেড়ে বিবিধ আস্বাদনের জিনিস ঢালেন, আলু, পটল, আম, উচ্ছে, পলতা, কুটকুটে কচু, ঝাল লঙ্কা, আধ পচা চিংড়ি। এ সব জড়িয়ে ঘর কন্না করা বলে। প্রাণ থেকে বেছে বেছে ভাল জিনিসই দেওয়া অসম্ভব, কারণ আপনি সব হৃদয় দান করেছেন। জানা কথা, মানুষের হৃদয় সাপ খোপে ভরা।

লাথি খাবেন, লাথি মারবেন। হিন্দীতে বলে, "মরদ আওরত জুতাসে বাত করতা হৈ।" একঘেয়ে ভালবাসার নভেলটি নেই। মারপিটের পর প্রেম আরো বাড়ে। ট্যাগ নামে একটা সাহেব ছিল পশ্চিমে। একদিন সে মেমের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে কারণ মেম তাকে কামড়ে রক্তপাত করেছিল। শুনে আমরা স্কুল পালিয়ে ছুটে দেখতে গেলাম।

ততক্ষণে প্রেম ডবল হয়ে গেছে। ট্যাগ ও টেগী কাঁচাউণ্ডে হাতে দাঁতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে Civil Surgeonকে হি হি করে হেসে বলছে, our love is the best in Tirhut, Captain! একটু আগে স্বামী ছিল কালান্তক যম, এখন 'লভে' হৃদয় উন্মত্ত। এইসব জড়িয়ে যে পতিপত্নীর প্রেম, তা মনে রাখলে মরণে কারও বেশী শোক হবে না, অনুতাপও আসবে না।

বঙ্কিমসৃষ্ট এক স্বামী (নাম মনে পড়ছে না) স্ত্রীকে বলছে, "তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? সমস্ত দিন গালাগালি দাও নাই" রেনলডস কল্পিত এক স্ত্রী স্বামীকে লিখছে, "আর তোমাকে মারব না। প্রাণেশ্বর, বাড়ী এস, অন্ধকার দেখছি।" Scott লিখছেন:

"Love swells like the Solway,
But ebbs like its tide.'

গানে আছে, চাই না চাই না চাই না লো তোর ওজন করা ভালবাসা। তেমনি লোয়ার কোর্ট উকিলের মতন গালি গুফতা মার পিট ক্রোল করবেন না। এ সব দাম্পত্যপ্রেমের গরম মসলা। হিন্দীতে বলে, "শাদি মে জুতা লাত, নিকমে চুম্মে চুম্মা।",

মধ্যবিত্ত গেরস্তর প্রেমের কথাই বিশেষ করে বলছি। স্ত্রীর রান্নাঘরের পরিশ্রমে এবং ঘন ঘন আঁতুড়বাসে শরীর ভগ্ন। স্বামী ভাবেন ইন্দ্রিয়লালসার জন্য বিয়ে করে তার সর্বনাশ করেছি, আবার রোজ ঝগড়া করেছি। মৃত্যুতে দারুণ ক্লেশ পান।

রাম-সীতা মনে রাখলে অনুতাপ হবে না। দুই বীরের অজ্ঞান-(unconscious) তাচ্ছল্যে সীতাহরণ; অগ্নিপরীক্ষা, বনবাস, পাতাল-প্রবেশ, আবার অগাধ প্রেম। দেবদেবীরই এই হাল। রাম সেজে শিশির ভাদুড়ী সীতার পা টিপেছেন, ব্যজন করেছেন। রোগে শোকে স্ত্রীর পা টেপা বাঙ্গালী স্বামীর দৈনিক কাজ; রাম রাজা পা টিপে কি স্বার্থ ত্যাগ দেখিয়েছেন? অফিসে খেটে খেটে স্ত্রীর জন্য বাঙ্গালী দেহপাত করেন।

স্পেনের মৃতদার রাজা vault এ নেমে embalmed পত্নীর হাতখানি ধরে তার জন্মদিনে ডাকতেন, "মিনা মীয়া! মিনা মীয়া!" রাম সোনার সীতা গড়েছিলেন। লাহোরে বলে, "জরুকি সিবারা চেবায়া ছয়ি পানি সব সে বড়া প্রত হৈ" (পত্নীর তিনবার চিবান পানের ছিবড়ে স্বামী চিবালে সবচেয়ে বড় প্রেম বলে)। এ তিনটার একটাও এ ভণ্ডামি বা বস্তুরতি (fetishism)।

বড় বাড়ী, রোলস রয়েস, হীরে মুক্তার গহনা দেওয়া প্রেম নয়, ধনী স্বামীর ডিউটি। ছোট জিনিসেই প্রেম প্রকাশ পায়। এক ধনীর

পত্নী সোনালী ফুটোবালা ছুঁচ বাজারে খুঁজে পান নি। হঠাৎ স্বামী একদিন একটা দোকানে পেয়ে দু পয়সায় দুটো ছুঁচ এনে দিল। ছল ছল চোখে স্ত্রী বললেন, 'এ ছুঁচ আমি কাকেও দেব না। কেবল তোমার বোতাম টাকবো।'

পত্নী স্বামীর ছোট খাট আরামের দিকে নজর দিলেই যথার্থ প্রেম প্রকাশ হয়। দাড়ি কামাবার নেকড়া যোগানো, 'এখন কয়লা ভেঙ না, বাবু ঘুমুচ্ছেন' চাকরকে ধমক, রান্নার দেরী থাকলে মুখে একটি লবনচুষ দেলা। এক বিপত্নীক ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিলেন, 'আমাকে রেখে সে বেশ গেছে, কিন্তু মুখে যে পোস্তর বড়া গরম গরম ফেলে দিত তা কখনই ভুলবো না!'

রান্নার পর ভাত তরকারি থালে বেড়ে তো সকল স্ত্রীই দেন, কিন্তু যে পত্নী রাঁধতে রাঁধতে একটু চাখিয়ে যায়, 'হাঁ কর তো!' বলে সেই রান্না ঘরের কালিঝুলি মাখা চন্দ্রাননীর স্মৃতি বিপত্নীককে হৃদয় শেল হানে। চুম্বন আলিঙ্গন স্মৃতি এর কাছে বর্জিত 'ছাট' মাত্র।

উদ্যোগিনী পত্নীর পতিপ্রেম ছাড়া যদি স্বামীর প্রতি পুত্রস্নেহ থাকে, অর্থাৎ হরদম তাঁকে খাওয়াতে পরাতে ইচ্ছে করে, এবং তাঁকে ও অন্যকে ধমক দিতে ইচ্ছে হয়, তাহলে সায়েন্স এই পত্নীকে domineering mother বলে। পত্নীর মুখকান্তির মধ্যে অন্নপূর্ণা জননীকে দেখে সিদ্ধপুরুষগণ 'মা! মা!' বলে ফুকরে ডেকে অস্থির হন।

শিশু পুত্রকে ঘন ঘন স্তন্যপান করানো স্বাভাবিক। তেমনি পুত্র-স্বামীকেও ঘন ঘন খাওয়াতে ইচ্ছে করে। আমার দিদিমা ছেলে মরে যাবার পর আমাকে মানুষ করতে লাগলেন। বেলা দশটায়

ভাত দুধ ইত্যাদি খাইয়ে ঘুম পাড়াতেন। সাড়ে দশটায় ঘুম ভাঙলে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কি খাবি রে?' আবার ঘুমুলাম, এগারটায় ঘুম ভাঙলো। 'অনেকক্ষণ কিছু খাস নি। লুচি ভেজে এনেছি খা।' আবার গাণ্ডেপিণ্ডে ভোজন। আধ ঘণ্টা পরে একটা কলা এনে বললেন, 'দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকিস না, কাহিল হয়ে পড়বি!'

রূপ যৌবনের উপর বেশী ভরাভর না দিয়ে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকগণ ধাত্রীরূপিনী নায়িকা গঠন করেছেন। 'দত্তার' বিজয়া নরেনকে ডাল-ভাত খাইয়ে ভবিষ্যৎ পত্নীর অভিনয় করছে। নৌকাডুবির বদলানো পত্নী নাসপাতি ছাড়িয়ে পরপুরুষকে স্বামী ভেবে খাওয়াচ্ছে। অনূঢ়া হেমনলিনী চা খাইয়ে নায়কের মনে প্রেম সঞ্চার করছে। উইলকি কলিনসের কুটনী মিস্ হলকোম নায়ক ওয়ালটারকে বলছে, 'আজ যেও না, ওরা তোমায় ব্রেড খাওয়াবে'। মোরগ মুখে খাবার তুলে টুক টুক ডাক দিয়ে মুরগীকে বশ করে। হৃদয় অধিকার করতে হয় পেট অধিকার করে। বউভাত প্রথা তাই চলে আসছে।

স্বামী আগে মরলে স্ত্রী কি বলে কাঁদে শুনেছেন তো? 'ও গো তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে গো!' পত্নীবিয়োগে যাঁদের সঙ্গিনীর অভাব গুরুতর বোধ হয় তাঁরা বুঝবেন স্বামী আগে মরলে স্ত্রীর আত্মা কষ্ট হতো, হয় তো রাঁধুনী হয়ে জীবন কাটাতে হতো। নিজ চোখে দেখছি।

এক প্রখ্যাত স্পেশালিস্ট আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার এ বন্ধুটির মনে পত্নীবিয়োগের ঘোরতর কুজ্ঝটিকা। আরোগ্যের একমাত্র উপায় আবার বিবাহ।' বয়স তাঁর পঁয়ষট্টি, তিন-জোয়ান অফিসার ছেলে। বুড়োর মুখে দুধ ভাত দেয়, গল গল করে বেরিয়ে আসে। এ টাইপের

রোগ নাকি সঙ্গিনী ভিন্ন সারে না। মৃত্যুও ঘটতে পারে। প্রায় প্রায়োপবেশন। তবু গ্রামে শুনতাম—

ভাগ্যিবানের বউ মরে,
অভাগার ঘোড়া মরে।

আমার একটি বারো আনা দামের কুঁকড়ো ছিল। তার বউ মরে গেল। সে একদম উপবাস করে থাকত। লখনউয়ের ভেট সারজন দেখে বললেন, 'জোড়া খানেসে আচ্ছা হো জায়গা, আনাজ ভি চুনেগা।' কক্ অ্যাণ্ড কহলার জার্মান আনিম্যাল সাইকলজিস্টের কেতাব হাতড়ে দেখলাম। পাঁচ টাকায় একটি অরপিংটন হেনবার্ড কিনে তাকে দিলাম, 'এই নে তোর নতুন বউ!' ধিন ধিন নাচতে লাগলো। "বজরী' খেল, রোগ সেরে গেল। বুঝলাম অনেক মাইণ্ডেও তাই।

বাপের প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই তিন রোজগারী ছেলে হয়দই সহরে এক ধেড়ে বাঙালী কনে খুঁজে বের করলো। 'বিহ্বল যৌবনের গুরুভার' তার (চোখের বালি ১৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আমরা পশ্চিমের এক বিখ্যাত শহরে তখন থাকি। বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনে হাসি, ঠাট্টা, গুফ্‌ত্‌-গু চলছে, খানগী বাতচিত হচ্ছে।

সকলে বলতে লাগলো, এইবার রোগ সারবে। হিন্দুস্থানীরা কানাকানি করতে লাগলো, 'মরদ সড়ক কা কুত্তে হৈ!' ফ্রয়েড বলেন, স্বামী স্ত্রীকে পত্নী বলে এবং সন্তানের মা বলে ভালবাসেন। তামিল ভাষায় স্ত্রীকে বৃদ্ধ স্বামীর মা বলে। এই বৃদ্ধটির সকল আইটেমগুলোই দরকার ছিল।

জুড়ী গাড়ী এল। বৃদ্ধ ফুলের মালা লাল পাড় গরদের ধুতি

পরল। তিন ছেলে বাপকে সাজাল। এর মধ্যে বুড়োর খিদে পেয়েছে! বললে, 'নরম সন্দেশ আছে? বড় বউ দুখানা লুচি ভেজে দাও মা, পুরুতকে লুকিয়ে খাই। তিনটে নড়া দাঁত কাল পড়েছে, আজ গোটা কতক শুলুচ্ছে।'

এক ছেলে হাতে জাঁতি দিল, বুড়ো বিরক্তির ভান করে বলল, 'আঃ তোরা এতও জানিস। আর কি করতে হবে বল!' তিনটে পুত্রবধূ ভোঁ করে শাঁখে আওয়াজ করলো। এক বউ বললে, 'বাবা কোথায় যাচ্ছেন?' আর এক বউ শিখিয়ে দিল, 'বাবা বলুন তোদের মা আনতে যাচ্ছি,—এই নিয়ম!' নাপিত টোপর নিয়ে দাঁড়িয়ে।

টোপর দেখে কর্তা কপট রাগ করলেন, 'তোরা মানুষকে বড় বেরক্ত করিস!' এক বন্ধু এলেন, তাঁকে দেখে কর্তা বললেন 'আজকাল ছেলে বৌরা কিরকম বে-আক্কেলে দেখেছেন?'

১৩৬১

পর্দা পদ্ধতি

"তাড় চড়ু হো!" হুংকার করল নব্বই বছরের নেংটি পরা, মাথায় নেকড়ার ফালি বাঁধা পাটনার মহুয়াবাগের পাসী। তাড়ির ভিটামিনে এখনও উন্নত গর্দান, বলশালী বাহু, স্ফীত ছাতি, বত্রিশটা আখ চিবানো দাঁত গুনে নিন। জয়দেব দেখলে গাইতেন :—

তাড় চড়নোচিত বিরচিত বেঁশা
ডোলত কোমরে ভাঁড়, ফেটিবাঁধা কেশা।

বেতের একটা চক্রাকারে বেড়ি দুই পায়ে দিল। দুই বাহু দিয়ে বিপুল আয়তনের গুঁড়ি আলিঙ্গন করে চড়তে লাগল। অনেক পথ বাহিত করে গাছের "টেহনি" প্রাপ্ত হল। কোমর থেকে একটা কাছি খুলে অনাবৃত দেহরত্নকে গুঁড়ির সঙ্গে নিরাপদ করে বাঁধল। এখন দুই হাত কোমরের কাস্তে ধরতে মুক্ত। চারিদিকে তাকিয়ে প্রাচীন এটিকেট আবার গাম্ভীর্যের সঙ্গে চিৎকার করে পালন করল "তাড় পর হো!" অর্থাৎ

এসেছি এখন আমি গাছের উপরে,
হে বধু বদন শশী ঢাক নীলাম্বরে।

পর্দা এয়ার বেন্তের মতন 'ডি-হুইস্‌ল' হয় না। মেয়েরা বুঝে নেয় পাসী চলে গেছে আবার ওবেলা আসবে অন্য কলসী বা 'লাবনী' লাগাতে। তাল, তালগাছ ও পর্দায় কি একরকম সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। পুরুষকে ভয়, লজ্জা, রাগ, পর্দা একটা তাল-বেল পাকিয়ে তুলেছে

বিহারে পর্দার বিবিধ বিকার দেখা যায়। পার্সী চলে যাওয়ার পরে মা মেয়ে ও নাতনী যাঁরা ঘোমটা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন এখন বিনা সঙ্কোচে

তাঁরা দুই মায়ে ঝিয়ে
এঁরা দুই মায়ে ঝিয়ে
তালতলা দিয়ে যায়
একটি তালের তিনটি আঁটি
সমান ভাগে খায়।

এখন ঘোমটা নামমাত্র। ঘাসের উপর বসে সুন্দরীরা তালের আঁটি চুষে চুষে সাদা করে বিহারের শোষণনীতি পালন করছেন।

পশ্চিমে রানী মহারানীরা দরজাবন্ধ পালকিতে বসে গঙ্গা চান করেন। কিংখাবের ঘেরাটোপ পালকি থেকে 'নোকরানীরা' উঠিয়ে নেয়। ষোলটা রাঙ্গা উর্দিপরা কাহার পালকি জলে অর্ধেক ডোবায়। ভকভক করে জল বেতের ফুটো দিয়ে ওঠে। মহারানী ভাবেন, অবগাহনে কি আরাম!

ঘেরাটোপ ঢাকা পালকিতে বসে মহারানীরা দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে রেলওয়ে ট্রাকে ভ্রমণ করেন।

আরবের যোদ্ধা যোবুখ্ ইশমাইল বাঙ্গালীর মতন পাশবালিশ জড়িয়ে শুতেন। একটা পাশবালিশের ওয়াড় নিয়ে দেখবার দুটো ছেঁদা করে পরমাসুন্দরী বিবিকে পরিয়ে লোকের চাহনি থেকে রক্ষা করলেন। এই সে দেশে পর্দার সূচনা। আবিষ্কারকের নাম থেকে এই ঘেরাটোপের নাম হয়েচে। এর উর্দু উচ্চারণ "বো-র-খা", হিন্দি "বু-র্-খা", বাঙ্গলা "বো-র-কা", ইংরেজী BURQA

• স্থানে স্থানে বাঙলাদেশে ঘোমটা অনেক কমে গেছে শুনতে পাই, কিন্তু বিবেকানন্দ রোডে নিত্যস্নাতা গঙ্গাপ্রত্যাগতা প্রৌঢ়াদের লম্বমান ঘোমটা প্রত্যহ দেখি। বছর বেড়েই যাচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে বধূর ঘোমটা এখনও জাগ্রত। দুটি নববধূর মাথার উপর সেই সেকেলে লম্বা ঘোমটা হালে বিবেকানন্দ রোডের বিয়ের দুটি বাড়িতে দেখলাম। ঘোমটা, চোখ বোঁজা ইত্যাদি পীড়ন এখনও চলে। বউ কথা আস্তে বলবে, ছুটবে না, কাশবে না, হাঁচবে না।

কর্তা হাঁচে জয়ঢাক বাজে,
গিন্নি হাঁচে নূপুর বাজে,
ছেলে হাঁচলে দুর্যোধন,
বউ হাঁচলেই অলক্ষণ।

প্রেম হলে বালিকা আপনি অধোবদন হবে। শেখাতে হবে না। বিয়েতে ঘোমটা দেবার মত লজ্জা জোর করে আনতে হয়, লজ্জাবস্ত্র ঢেকে, সিঁদুর ঢেলে, মন্ত্র পড়ে। সমাজ এই ঘোমটা রাখতে ব্যস্ত, সংগীত ঘোমটা খুলতে ব্যগ্র।

ও বউ, কওনা কথা মুখ খুলে
চাও না ও বউ চোখ মেলে,—ইত্যাদি

নবীন পল্লবে সুললিত গাইবার ঢং উপলব্ধি করে অপার উৎসাহে বঞ্চিতবাক্ বধূকে সহানুভূতি দেখিয়ে ঘোমটাবিমুখ দল পাখির নাম রেখেছেন "বউ কথা কও!" নামকরণে ভাষায় এত মাধুর্য কোথাও দেখিনি।

ঘোমটা খোলা হলেই পর্দা উঠে গেল তার কোন মানে নেই। লাট-গিন্নিদের পর্দা পার্টি হ'ত। কেউ ঘোমটা দিয়ে চা খেতে যেত না। ঘোমটা পর্দার শাখা মাত্র

পুরুষেরও ঘোমটা আছে। বিহারে রাজ-রাজড়ার শালা দরবারে ঘোমটা দিয়ে যেতেন। বিয়ে বাঘশিকারের মত। বড় বড় ক্রোড়পতিরা রাঙ্গা পালকিতে চড়ে বিয়ে করতে যাবার সময় গুরুজনের আদেশ নেন, "ক ক হো! হাম শিকার খেলে যাইছি।" যার বহিনকে শিকার করে নিয়ে গেছে, সে কি করে সেই শিকারীর দরবারে মুখ দেখাবে?

হ্যারিসন রোড প্রসেশনে বরের মুখ মুক্তার ঝালরে ঢাকা থাকে। পুরুষেরও বিয়ের সময় লজ্জা আসে কিনা। "তোর না কি বিয়ে হবে?" প্রশ্ন শুনলে, বন্ধু বন্ধুকে বলেন, "ধেৎ।"

নারীর কাছেও নারীর পর্দা প্রশংসনীয়। বধূ প্রৌঢ়া হয়ে গেলেও, ঘোমটার কাপড় তখন কমে গেলেও, পর্দার আতঙ্কটা থেকে যায়। প্রৌঢ়া বধূ গিন্নী হয়েও, ভাঁড়ারের চার্জ পেয়েও, শাশুড়ী বুড়ীর ভয়ে পেট ভরে খেতে পান না। অকর্মণ্য বুড়ী ঠুক ঠুক করে ঘুরে বেড়ায়, নজর রাখে বউ বেশী খেয়ে ফেলছে কিনা, তার ছেলের টাকা নষ্ট হচ্ছে কি না। কাজেই প্রৌঢ়া ক্ষুধার্ত বধূ চট করে ভাঁড়ারে ঢুকে এক চুমুক দুধ চোঁ করে মুখে টেনে নেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে তাতেই একটু চিঁড়ে এক চিমটি চিনি, আধখানা মর্ত্তমান ফেলে দিয়ে কোঁক করে গিলে ফেলেন। আমাদের গ্রামে একে "গাল-ফলার" বলে। বাসনের দরকার হয় না।

আর একটা টেকনিক্যাল শব্দ আছে। প্রৌঢ়া বধূ থুথুড়ে শাশুড়ীর ভয়ে এক গাল লুচি-সন্দেশ মুখে ঠুসেছেন। চটপট্ চিবিয়ে গিলে ফেলবেন এই আশা, কিন্তু বুড়ী বুঝে ফেলেছে বউ লুকিয়ে খাচ্ছে। হঠাৎ বুড়ীর অফিসার ছেলে স্ত্রীকে ডাক্‌ল "দেখ—ও—

এদিকে, কোথা গেলে—শোনো—ওঁরা গেল কোথা?" বুড়ী মুচকে হেসে বেটাকে নতুন ভাষা শেখালে, বউমার বদন ভারী।

চারখানা বাসি লুচি ও তিনটি কড়াপাক এক সঙ্গে গাদলে আর বদন ভারী বা বাক্‌শক্তি লোপ হবে না! বৃদ্ধা ছেলেকে বললেন, বউমার গালটি যেন একনলা গাদা বন্দুক; সন্দেশের গোলা, কচুরির বারুদ গেদেই যাচ্ছেন।

জার্মান সায়েন্টিস্ট হাগফেল্ট তার চীনা বন্ধুর সঙ্গে পাশিবাগানের এক বাড়ির মাতৃ-শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়েছিলেন ২১ বছর পূর্বে। জার্মান ভাষায় দেশে ফিরে কেতাব লিখেছিলেন, সেটার অনুবাদ বিলেতে হয়েছিল ইংরেজীতে। তাতে আছে "এত সভ্যতা, লেখাপড়া শিখেও এই বাঙ্গালীরা মেয়ে পুরুষ পৃথক গৃহে খেতে বসে, আমি দেখে অবাক। এই পর্দার জন্য ভারতবাসী এক এক সময় সংকটে পড়ে।"

. কি রকম সংকট? উদাহরণের গবাক্ষ উন্মুক্ত। পর্দার দৌরাত্ম্য দেখুন। এক শিক্ষিত সভ্য বিলাত-ফেরত ভোজ দিলেন। কম্পাউণ্ড "গোবরেন" করে শামিয়ানা টাঙ্গানো হল। মাঝখান দিয়ে চালিয়ে লম্বা থাম্বা সুন্দর কানাতের দ্বারা পার্টিশন হল, একটায় মহিলারা খাবেন, একটায় পুরুষ মানুষ। এটা পূর্বরাগ প্রীতিভোজ। বিয়ের দেরী আছে। ভাবী বধূ (হাফ মিসেস্) খাবেন। নানান কারণে এবার চৈয়ার টেবিল হল না। মাটিতে কার্পেটের রোল পাতা হ'ল। এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক চিংড়ির কাটলেট গোটা পঁচিশ খেয়ে হাঁসফাঁস করছেন। কানাতটা একটু ঠেস দিলেন। নরম তুলতুলে এক মহিলার পিঠ তার পিঠে ঠেকল!

কোলাহল উঠল লেডিজদের ডিপার্টমেণ্টে, "কে রে! কে রে! অসভ্য, ইতর, অভদ্র, জানেন এদিকে লেডিজরা বসেছে?"

পৃথক বসার কি বিপদ জার্মানরাও জানে। ঝগড়া ছাপিয়ে উঠল। একটি কেঁদো কুঁদুলী রায়বাঘিনী রমণী খাওয়া ফেলে পুরুষের ডিপার্টমেণ্টে এঁটো হাতে কোঁদল করতে এলেন পাপর চিবুতে চিবুতে—

"ও মশায়! করেছেন কি, ছি ছি ছি! ভদ্রমহিলা নিষ্ঠাবতী—অপমানিত বোধ করছেন। ঘেন্নায় মরি মা! ঘেন্নায় মরি!"

বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি দই-মাখা মুখখানি কেঁচু মেচু করে বললেন, "তাঁকে মাপ করতে বলুন; অসাবধানে ঠেস দিয়ে ফেলেছি। তাঁর স্বামীর নাম বলুন, জোড় হাতে তাঁর ক্ষমা চাব।"

মহিলা বল্লেন, "স্বামীর নাম মিস্টার ঝুলনকৃষ্ণ ঝট্‌কা, সেসন জজ, জানেন, তিনি আপনাকে ফাঁসি দিতে পারেন! অনেককে ঝুলিয়েছেন; তাঁর স্ত্রী পরপুরুষ ছোঁন না।"

ভদ্রলোকটির মুখ প্রফুল্ল হল; বললেন, "আর দুটো রাজভোগ ও এক খুরি গাঙ্গুরামের দই দাও তো ছোকরা,—আজ্ঞে, মহিলাটিকে বলুন আমাকে আর না ঝোলান, সেই বিশ বছর পূর্বে ছাঁদনাতলা থেকে আমাকে ঝটকা টান দিচ্ছেন। উলোর বিখ্যাত ঝটকা বিকল্পে ঝটক বংশ প্রায় লোপ। আমি-ই একা বেঁচে।"

জজ সাহেব তার পরদিন আড্ডাতে মজার কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। রেবা বাড়ী ফিরে তাঁকে বলেছিলেন, "ভাগ্যিস্ সেটা তোমার পিঠ ছিল! পুরুত ঠাকুর বললেন, তা না হলে আমাকে কৃষ্ণকলঙ্কিনী ব্রত করতে হত; তোমার এক মাসের মাইনে খরচ হয়ে যেত।" জজ সাহেব বলেছিলেন, "রেবা, তোমার পিঠটা কি মোলায়েম

লাগল!" রেবা উত্তর দিলেন, "তা তো লাগবেই ; আমার পিঠ জানতে না তো। মনে নেই কানপুরের বুড়ি মহারাজিন বলত, মরদ কুত্তা কি জাত হ্যায়।"

সংকট নং ২! আসুন আমার সঙ্গে সংকট দেখতে আবার এক সভ্য বিয়েবাড়ি। আমরা দশ বারজন ৮০—৯০—১০০ মার্কা একটা হলে বসেছি সোফার ওপর। দেওয়াল বিয়ের জন্য চুনকাম হয়েছে। এটা এত সভ্য মার্জিত বাড়ি যে কুকুরটাকে পর্যন্ত হাফপ্যান্ট পরানো হয়েছে, সে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ধারণা ছিল নিমতলা-মার্কা আহুতদের কাছে সভ্য মহিলা পর্দার বহির্ভূত। কটাক্ষে ক্যাটারাক্ট, প্রেমে পিত্তি পড়েছে, প্রাণ পাষাণ, অঙ্গ অঙ্গার, কক্ষ কঙ্কাল, বুদ্ধি বাহাত্তুরে, আর যমের ট্রাঙ্ক-কল সম্মুখবর্তী।

বাড়ির এক বৃদ্ধ কর্তাব্যক্তি হঠাৎ এসে বল্লেন, "ইসে! আপনারা একটু দয়া করে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ান,—এক মিনিট ; এ দিক দিয়ে লেডিজরা যাবেন।"

লেডিজ সকলের ওপরে, প্রায় অনেকেই বিলাত-ফেরত, তবু এত পর্দা। তাঁদের নিচে 'মহিলা', তাঁদের নিচে 'রমণী', তার নিচে "নারী", আর সকলের নিচে আমাদের এই অধম গেরস্ত ঘরের "মেয়েরা";— শাড়িতে রান্নাঘরের চিংড়ি ভাজা ধোঁয়ার সৌরভ ; উড়ে রাঁধুনীটিকে টুঁটি টিপে ডিসমিস করে নিজে দশ আঙুলে কাঁচা মাছ মহানন্দে তেল নুন দিয়ে চটকাচ্ছেন, পাছার বসনে হলুদ মুছেচেন দু-দিকে দুহাতে,—শুখনো মুখে সুমধুর নিমন্ত্রণ, খাবে এস! ভাত হয়েছে, ইলিশের ঝাল নামল বলে ; আজকের মাছটা খুব তেলুক।

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, চুনে, নাক ঘষে প্রাণটা গেল। মিনিট যাচ্ছে না বছর যাচ্ছে। কতগুলো লেডিজ, মিসেস হাকমিসেস মিসিবাবা দিদি সাহেব, দেশী দিদিমণি, নভেলের বউদিদি, কালিদাসের নায়িকা সাজ করছেন যে এত দেরি?

সুরুচিসম্পন্ন অলংকারের অগণনীয় জটিল জালে জড়িত তাঁরা কিছু ঝুমঝুম ধ্বনি করবেনই। এইবার বোধ হয় আমরা দেওয়ালের দিকে তাকিয়েও চল্লিশ জোড়া ভেলভেট স্যাণ্ডেলের মৃদু তরঙ্গ শুনবো; এবার বোধহয় অগুরু ইভ্‌নিং-ইন-প্যারিসের খুশবু ফোয়ারা ছুটবে; এবার বোধহয় শাড়ি ব্লাউজের ঈষৎ পবনহিল্লোল নিদ্রাতুর চিন্তাকে চঞ্চল করবে; এবার বোধহয় উদভ্রান্ত পাউডারের আকাশসঞ্চারী অদৃশ্য রেণু ফ্যানতাড়নে জরাজীর্ণ অ্যালার্জি পীড়িত নাসারন্ধ্র বিহ্বল করবে। এইবার বোধহয় চশমার প্রতিবিম্ব পাতে চলচ্চিত্র দেখব—নীলাভ, 'ফন', 'মভ', 'পিঙ্ক' বিবিধ বসনের বিকম্পিত বিভা।

বকাণ্ড প্রত্যাশা! কিছুই দেখছি না, পা আড়ষ্ট, হাতে খাল ধরছে। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে বললেন "ইসে, আপনারা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে এমন করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" তিনি উত্তর পেলেন "আজ্ঞে, শুনলাম লেডিজরা যাবেন তাই।"

ভদ্রলোক বললেন, "তাঁরা তো অনেকক্ষণ চলে গেছেন, টের পান নি?"

উর্দিপরা পাটনার বেয়ারা বল্লে—"নাকমে চুনা লাগা, পোছ ডালিয়ে হুজুর। হাম ভি নাক ঘসড়া (নাকে খত দিয়েছি), হিঁয়া নেই কাম করেঙ্গে।"

১৩৬০

ভালুকের আফিম

ভূতনাথ যখন এম এ, পাশ করে নিজের হৃদয়ের দ্বারোদঘাটন করলেন একদিন, দেখলেন নিকটের বাড়ীর ষোড়শী 'মা-নু' সেই হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন।

রোজ পূজা ধ্যান ইত্যাদি চলতে লাগল। ভূতনাথের বাপ হোসেঙ্গাবাদের খুব রোজগারী ভকিল, কিন্তু একটু 'বকিল'ও বটেন, হিন্দীতে যাকে কৃপণ বোঝায়, তাই 'বাকল' উকিল ভোলানাথ বাবু যৌবন-মদমত্ত ছেলের বিয়েতে তত গা করেন না, বৃথা টাকা সব ভোজে ভাজে খরচ হয়ে যাবে বলে। অল্পদিনের জন্যে কলকাতা এসেছেন।

'মা-নু' অপার বর্মার ব্যারিস্টার মিস্টার প্রভাতসূর্য মিত্র সাহেবের একমাত্র মেয়ে। উকিল এবং ব্যারিস্টার সাহেবের কলকাতায় এক পাড়াতেই বাড়ী! ভূতনাথ বাড়ীতে বুড়ী মাসীর সঙ্গে চাকর বাকর নিয়ে থাকে, বাপ বিদেশে। প্রভাতসূর্য কিন্তু অল্প বয়সে রিটায়ার করে এসে বসেছেন, বর খুঁজচেন। কলকাতায় প্রাকটিস করবার ইচ্ছাও আছে।

উকিলও মা-নু কে দেখতে গিয়েছিলেন। ব্যারিস্টারও ভূতনাথকে দেখে গেছেন। বিয়ে দিতে কারও 'গা' নেই। এর পর দেখা যাবে বলে ভোলানাথ হোসেঙ্গাবাদে সস্ত্রীক চলে গেলেন, যাবার সময় তাঁর শালী বুড়ী বলল, 'সাপের লেজে বাড়ি মেরে রাখলে ভোলানাথ!' ভোলানাথ বললেন, 'তুমি এখনও ছেলে মানুষ।'

যাবার সময় পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নিমাই ছোকরাকে বলে গেলেন,

'ভুনিকে যেমন দেখছিলে বাবা মিমু দেখো! মাঝে মাঝে একটা পোস্টকার্ড দিও লিখে। নিমাইয়ের অন্দর মহলে ভুনি যেত, নিমাইও ভুনিদের বাড়ীর ভিতর আসত।

'নিমাইয়ের বাড়ীও একই পাড়ায়। নিমাইয়ের বাপ পয়সা রেখে গেছেন, তাতেই তার ও ক্ষুদ্র পরিবারের স্বচ্ছন্দে দিন কাটে, নিমাইয়ের চাকরী করতে হয় না, বউ রাঁধে, চাকর বাজার করে। নিজে পাখী চুখি শিকার করে আনে। 'ভুনিকে বড় ভালবাসে। বললে একদিন—'উঃ! শুনছিস ভুনি, এ মেয়ে বাংলা ভাষার 'মান্থ' নয়; এ ফাঁক করে লেখে ইংরাজীতে Mah Noo (মা—হু)। আমি ব্যারিস্টার সাহেবকে তাগাদা দিচ্ছি। উনি কিন্তু ও রাস্তায় মধুময় ছোকরার দিকে ঝুঁকছেন।'

'মেয়েটাকে জলে ফেলবে নিমাইদা! আচ্ছা আমি যদি বাই এয়ার সাত দিনে লণ্ডন ঘুরে আসি—তা হলে ব্যারিস্টার সাহেব বিবেচনা করবেন কি?'

'সে ত পূজা কনসেসন ট্রিপের মতন! সাত দিনে কে তোকে একটা ডিপ্লোমা দেবে? ভুলে যা মা-হু, টাকিন—হু, টু—টু, মং বা টু, আর সব বাছাই করা নাম। তোকে একটা দেশী নলিনী কামিনী ভামিনী জুটিয়ে দেব দেখে শুনে। তুই কতবার মা-হুকে দেখেছিস রে ভুনি!'

'ওর বাপের সঙ্গে ফুটপাথে বেড়ায়। অনেক বার দেখেছি—ংকার নাম, নিমাই-দা!'

মেয়েটা বর্মায় জন্মেছিল, তাই বাপ তার বরমিজ নাম রেখেছিল 'মা-হু'। কিন্তু আসল মা-হু ছিল মাণ্ডেলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী

মাং-হুং-ঘাইনের পরমা সুন্দরী কন্যা। নকল মা-হুও রঙে আসলকে হারিয়ে দিয়েছিল! মুখশ্রীও তেমনি চমৎকার। মোহিত হওয়ার জন্য ভুনিকে দোষ দেওয়া চলে না। ভুনিও অতি সুপুরুষ। লোকে মনে করে বাঙ্গালী বাড়ীতে এত রূপ দেখা যায় না। এ কেবল নভেলের ও ছোট গল্পের কল্পনা। দুটিতে বেশ মানাত কিন্তু ব্যারিস্টার সাহেব ভুনি বিলেত যায় নি বলে অবশেষে পছন্দ করলেন না। জাপান থেকে ট্যানিং শিখে এসেছিল বলে তিনি এই এম. এসসি পাশ মধুময় ছোকরাটিকে পছন্দ করলেন, ভুনির চেহারার কাছে মধুময় একটি চামার।

ভুনির প্রাণে তাই আরও আঘাত লাগল। সে তার হিতৈষী নিমাইদাকে বললে 'দাদা এ প্রাণ আর রবে না—রবে না!' নিমাই ধমক দিয়ে বলল, 'ও সব ছোকরাই বলে থাকে, তারপর আবার পাকা দেখার দিন ফুর্তি কি!'

আজ মা-হুর বিয়ে মধুময়ের সঙ্গে।

পাড়াসুদ্ধ নিমন্ত্রণ। নিমাই ও ভুনি নেমন্তন্ন খেতে গেল। হায়রে, সেই মা-হুর-ই বিয়েতে! নিমাই শিকারী পুরুষ, খাইয়েও বটে। খুব লুচি চিংড়ি সন্দেশ খেল। ভুনি তার পাশে বসে একটু করে লুচি ভেঙ্গে মুখে দিয়ে থু করে ফেলে দিল। মনে আঘাত লাগলে সব জিনিসে অরুচি হয়। ভাবনা কেটে গেলে তৎক্ষণাৎ খিদে হয়।

খেতে খেতে ফিস ফিস করে নিমাই বলতে লাগলো, 'তুই ত আচ্ছা পাগল ছেলে! ফিলজফিতে এম, এ, পাশ নয়? তার কি এই শিক্ষা? আমি তোর কনে দুটি একটি দেখেছি, আরও দেখবো। খা! চিংড়ি কাটলেট মস্‌টার্ড মিশো, এই চপটাতে একটা কামড় দে। মা-হু ছাড়া

কি আর লোকের বউ হতে নেই? চল! কাল আমরা কনকেনাড়ায় পাখী শিকারে যাব। কি 'চাহা' সেখানে! জঙ্গলি। বক্তকও খুব। তোকে আসছে বছর পোচার্ডের মাংস খাওয়াবো। এবছর উত্তুরে হাওয়ায় তারা আসে না। ধাঁই! ধাঁই। ভুনি, গুলি করতে কি আরাম! তবে রান্না ভাল হয় না বাঙ্গালী বাড়ীতে। চিম্‌সে করে ফেলে। কিন্তু আমার একটা গুলিও ফসকায় না। দেখেছিস তো!'

"কনকিনাড়া গিয়ে কি নিমাই-দা এত বড় শোক ভোলা যায়? যেখানে যাবার আমি মনে মনে ঠিক করেছি।'

'তোর কি আত্মহত্যা করবার সাহস আছে? কনে ফসকে যাওয়াতেই মনে একটু সাহস দেখাতে পাচ্ছিস না হতভাগা।' ভুনি বললে, 'দেখে নিও বিষ খাবো, সক্রেটিসের মতন সাহস দেখাব। মরতে আমি ভয় খাই না।'

একটু মন সংযত করে দু জন বাড়ি এল। তার পরদিন কাঁকনাড়ায় খুব শিকার করে দু জন ক্লান্ত হয়ে ঘাসে বসে টিফিন খেতে লাগল।

যে কয় ঘণ্টা দুড়ম দাড়াম বন্দুক চলেছিল গগনচারী গুলিকে দেখবার ভুনির কৌতূহল হ'ল। পবনস্পর্শে 'শট' কোথায় আকাশে উধাও হচ্ছে। নির্ভুল লক্ষ্যে নিরীহ পাখী টপাটপ পড়ছে! ভাবল নিমাই-দা এত ভাল হয়েও কি নিষ্ঠুর! সব করতে পারে, মানুষ মারতে পারে!

মনে মনে স্থির করল, নিরীহ পাখীর মতন সেও জীবন বিসর্জন দেবে; বিষ কালকেই কিনতে হবে, অনলে ধাবিত পতঙ্গের মতন ভুনি নিমাইয়ের সঙ্গে বাড়ী চললো।

ভুনি পাখী মারে না, কেবল শিকারে সাহায্য করে। তার পরদিন নিমাই একটি কনে দেখতে গেল বালিগঞ্জ। ভুনি বলছিল, 'কেন বৃথা

কষ্ট করছ নিমাই-দা, আমি বিয়ে করবো না, যদি জোর করে বাপ খুড়ো বিয়ে দেন তবে বাসর ঘরেই কনে বিধবা হবে।'

নিমাই হেসে বললে, কোনও বাপ খুড়োর জোর করার সাধ্য নেই। বর ইচ্ছায় আপনি না গেলে কার সাধ্য বিয়ে দেয়।'

যে 'বসে' নিমাই গেল, তার পরের 'বসে' চুপি চুপি ভুনি-ও উঠল! হঠাৎ ভুনি ভাবলে 'আমি তো মা-মুর স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকের মতন কিছু করছি না। কেবল লুকিয়ে দেখবো এই কনের কেমন বাড়ি, তার ভাইটাকে দূর থেকে দেখতে পাই তো বুঝবো রং ও মুখশ্রী কেমন—না এটা বেইমানি-ই বোধ হচ্ছে, বাড়ি ফিরি।'

ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে দেখল একটা ভালুক মরে পড়ে আছে, তার নাকের দড়িটা হাতে ধরে দাড়িবালা রক্ষক একটি গোলাকার ক্ষুদ্র ভিড়কে দুঃখ করে বলছে:—'আব রোজি গেলো বাবু হামি কি খাবে? একটু আফিম খেইয়ে আরে নাচে নাচে বললেই নাচতো আর চারিদিক থেকে পয়সা এক আনি দোয়ানি পড়তো! বেচারার কাছ থেকে মসক্কৎসে কাম লিয়েছি।'

ভালুকটার কিপার একগোলা আফিম দর্শকদিগকে দেখাল: এই দেখেন। আফিম্ মিলা কেতো ঝামেলা, পাঁচ রুপিয়ায় আফিম, হামি লালবেবুয়ার জন্যে পুঁজি করছিলাম, এ এখন কে খাবে? বিলকুল বরবাদ!'

ভুনি দুটো টাকা দিয়ে চুপি চুপি বলল, 'দাও!'

ভালুকবালা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিল, বললে, 'দরদে মালিশ করবেন ঘি দিয়ে, এতে দুনিয়ার তামাম তখলিভ ভালো হোয়।' এ লেনদেন কেউ দেখলেও না চেয়ে, কনস্টেবলও তখন আসেনি।

ভুনি বাড়ি ফেরার উপক্রম করছে, এমন সময় জনতার একটা ছেলে বলল, 'একবার নাচে! নাচে! 'বলে দেখ না যদি লালবেবুয়া বেঁচে ওঠে!' ভালুকবালা বলল, 'দিল্লগি করছেন বাবু, জান গেলে কি জানোয়ার নাচে?'

জনতা তা শুনলে না। সকলে চীৎকার শুরু করল, 'আরে নাচে! নাচে!' ঐ যে লেজ এক ইঞ্চি নড়ছে কেউ বলতে লাগলো। পাছে ভালুক সত্যই নাচে ও আফিমটা রক্ষক ফেরৎ চায় সেই ভয়ে ভুনি ডবল কুইক স্টেপএ চলতে লাগলো মোড়ে ট্রাম ধরতে।

একটা দোকানে সাইনবোর্ড দেখল 'খাঁটি সরষে তেল।' বলল 'একটা শিশি দিতে পার?'

দোকানদার জিজ্ঞাসা করল—'ক সের নেবেন।' ভুনি বলল 'এই মোটে দু ছটাক।'

'ওঃ! তবে এই ছোট শিশি আমার আছে তাতে দি, দু আনা শিশি, চার আনা তেল!' ভুনি তাই দিল।

'এতটুকু তেলে কি করবেন বাবু? আফিং এর সঙ্গে মিশিয়ে মালিশ করা হবে বুঝি কোমরে কারো?'

ভুনি বলল, 'হ্যাঁ।'

দোকানদার জবাব দিল, 'চমৎকার ওষুধ, সব যন্ত্রণা ভাল হয়ে যায়!

বাড়ি পৌঁছে ভুনি তেলের শিশিটা ও আফিম টেবিলের ওপর রাখলী। জগা চাকর দেখল, আফিমের গন্ধও পেল। সে চুপি চুপি নিমাইকে গিয়ে বল্ল। জগা জানত যে ভুনি ব্যর্থ প্রেমে আকুল হয়েছে। বিয়ে ফসকে গেলে মানুষ খুব কষ্ট পায়, অনেক মেদিনীপুরের চাকররা খুব বোঝে। তারা নভেল পড়ে।

নিমাইয়ের সেদিন খেয়ে দেয়ে বিকালে কোনও কাজ না থাকায় ভাবল, দমদম রোডের ধারে চুপিচুপি দুটো একটা পাখী মারবো। কিন্তু দুগার মুখে খবর শুনে ভাবিত হ'ল। বন্দুক হাতে নিয়ে ভুনিদের বাড়ির দিকে তাকে শিকারে টেনে নিয়ে যাবার জন্য দ্রুত চলতে লাগল।

এদিকে ভুনি নিজের ঘরে বসে একখানা চিঠি লিখল, 'বড়তলা ইনস্পেক্টর, মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' একটা পোস্টকার্ড লিখল, হোসেঙ্গাবাদে—'বাবা! মা! চল্লুম, কেঁদ না, আর এক ছেলে তো রইল—ভুনি।'

জোড় হাতে ফিস ফিস করল, 'মা কালী! অনেক কষ্ট পেয়েছি জীবনে, ও রাঙা চরণে স্থান দিও মা।'

দরজায় খিল দিল, একটা জানালা বারান্দার দিকে খোলা রইল। কাঁসার গেলাসে দেড় ভরি আন্দাজ আফিম দু ছটাক তেলে চামচে করে জোরে জোরে মাড়তে লাগল।

তার মনে পড়ল সক্রেটিস 'হেমলক' খেয়ে বীর হয়েছিলেন। ভাবল, 'আমিও তো ফিলজফিতে এম এ। ইউনিভারসিটি অফ ক্যালকাটা কি বোগাস্? সক্রেটিসের মতন ফিলজফার বের করতে পারে না? আমি সক্রেটিসের মতন স্থির থাকবো। এই আমার ঘর! ঐ আমার বিছানা! ঐ কেতাব কলম পেনসিল! ঐখানে বসে মা-তু কে পদ্য—সব যাক্! এবারে খাই! মা-তু!'

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে গেলাসটা মুখে তুললো,—এমন সময় জানালার লোহার বারে বন্দুকের ব্যারেল ঠোকার খটাং করে আওয়াজ হল।

ভুনি দেখল ভীমমূর্তি কৃতান্ত তার বুকে নির্ভুল 'এম' নিয়েছে,— জানত অব্যর্থ তার নিশানা।

ঘূর্ণনেত্র নিমাই হুঙ্কার ছাড়ল, 'ফেল বলছি আফিম, নইলে দুম করে গুলী করবো!' ট্রিগার টানে আর কি।

ভুনি চিৎকার করল,—'মের না! মের না! নিমাই-দা! মের না! আর কখনও মরতে যাব না।—ফেলে দিলাম এই যে।'

-১৩৬০

জাতি নিপাত

জাতি যাবার ভয়ে আমরা চিরকালই অস্থির। এখন কিছু কমেছে বটে। এক শ বছর পূর্বে কলকাতার রাস্তায় জাত পাতের দুঃখ বাউল সংগীতে শোনা যেত

'কলিকাল স্রোতে এবার ডুবলো হিঁদুয়ানী,
ভোলা মন ডুবলো হিঁদুয়ানী!
এই প্রথম কলির ঢেউ রামমোহন তুলে
একাকারের পথ দিল খুলে,
হিন্দুর মেয়ে শাড়ি ফেলে
ভোলা মন! পরছে পোশাক বিবিয়ানী।
কলি—কা—আ—আল—স্রো—তে—এ—এ
এবার ডুবলো হিন্দুয়ানী!
তার পরে রামগোপাল এসে
এই খানা খাওয়াটা শিখিয়ে দেশে
জেতের দফা করলে রফা
ভোলা মন! ঢালিয়ে ব্রাণ্ডি লালপানি!
তার পরেতে যাও বা ছিল
ঐ স্যানজা মশাই সব শুধিলো
ধোপানী ব্রাহ্মণী হলো
হোল ব্রাহ্মণী ধোপানী।
কলি—কা—আ—ল স্রোতে এবার ডুবলো হিন্দুয়ানী
ভোলা মন! ডুবলো হিন্দুয়ানী!

পঁচিশ বছর পূর্বে 'হিন্দু ডুবিল' নামে এক কেতাব বেরিয়েছিল। উপহারও পেয়েছিলাম। এখনও ডোববার ভয় পুরো যায় নি।

একটি যুবতী বৈষ্ণবী জাত যাবার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকত। পাখীর মুখে কৃষ্ণনাম শুনতে সে ব্যাকুল হল। বৈষ্ণবকে বলল, আমাকে একটি টিয়ে বা ময়না কিনে দাও, শুনে কান জুড়াবে। কেউ জাত মারতে পারবে না।

বৈষ্ণবের অনেকদিন ধরে রামপাখী খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। যে একবার বৈষ্ণব হয়েছে, তার কোন জিনিসে জাত যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবী স্ত্রীলোক, এত জ্ঞান নেই। তার ভয়ে বৈষ্ণব রামপাখি খেতে পারত না।

এবার একটা অসুবিধা গেল। বৈষ্ণবী একটু হ্যাকা মেয়ে, কখনও ময়না, চন্দনা, টিয়া রামপাখি দেখে নি। বৈষ্ণব একটা কুঁকড়ো কিনে ফেলল। বলল, খেপি! তোর জন্য খাসা পাখি এনেছি, একে পড়া, এ তোকে হরিনাম কৃষ্ণনাম শোনাবে!

বৈষ্ণব ভাবলো, দিনকতক পরে এটাকে বঁটিতে কেটে বৈষ্ণবীকে দিয়ে রাঁধাবে; তাকেও লেকচার দিয়ে খেতে রাজি করাবে।

মাথায় রাঙ্গা ঝুটি দেখে বৈষ্ণবী কুঁকড়োটাকে খুব আদর করতে লাগলো। বলল, 'আহা সুন্দর ময়না! যেন মা কালী নিজের চরণ থেকে একটি জবা তুলে এর মাথায় কৃষ্ণের জীব বলে আশীর্বাদ করে করে পরিয়ে দিয়েছেন; পড় বাবা ময়না।

কৃষ্ণ গো-ধেনু চরায়!
কৃষ্ণ, পাতকী তরায়!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম! রাম!

চিত্রকূট কি ঘাট পর
পড়ে সন্ত্ কি ভীড়,
তুলসীদাস প্রভু চন্দন ঝগড়েঁ
তিলক করেঁ রাম রঘুবীর!
পড়ো জী আত্মারাম!

দুই মাস পাখী পড়িয়ে বৈষ্ণবী নিরাশ হল, কৃষ্ণনাম না শুনে ব্যস্ত হল। পাশের বাড়ীর বান্ধবী বৈষ্ণবীরা তাকে বলেছে, এ পাখিতে নাকি জাত যায়। সে স্বামীকে একদিন চেপে ধরলো :—

প্রাণনাথ, বল শুনি
ময়না কবে পড়তে শিখে
ঢালবে কানে ঠোঁটটি রেখে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি!
দু মাস ধরে পড়াই গো
বলছে কেবল কোঁকর কোঁ!

বৈষ্ণব বৈষ্ণবীকে সান্ত্বনা দিল :—

তবে শোনো বলি প্রিয়ে
এটা পাকিস্থানী টিয়ে!
পড়বে 'চাচা' 'নানা' 'ফুপা'
'খালু' 'মামু' বলবে তোফা
পেঁয়াজ রসুন খেয়ে!

জাতের স্বধর্ম আজ চিঁড়ে দই সাত্ত্বিক আহার, কাল যবনের সিক কাবাব, কামনা করে এই রকমে আপন পরকাল ভাঙ্গে ও গড়ে। এক মৃত ভদ্রলোকের ডায়েরিতে এই আক্ষেপ পাওয়া গেছে :—

বসন্ত রাগেন, গীয়তে।

জাত গেল মান গেল সঙ্গে গেল কুল
কাবাব খাওয়ালে ভাল গুলাম রসুল।
পায়ে হেঁটে গঙ্গা ঘাটে এসু চান করে
উড়িয়া ঠাকুর পুনঃ জাত আনে ফিরে।
একদিন রাঁড় গিন্নী গেলা কালীঘাটে
আবার গেল রে জাত চপ কাটলেটে!
কোরমা, কোফতা, কারী, ফিরনিও অতুল
মিঞার হোটেলে রাঁধে গুলাম রসুল!

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র সকলেই শলাকা পক্ক মাংস খেতেন; কারো জাত যায় নি। সকলেই স্বর্গে গেছেন। আর আমরা বাঙ্গালী কি বলি?—'কি লজ্জা কি! লজ্জা! Zakaria Street এবং Nawab Abdur Rahaman Street গিয়ে দেখি বড় বড় সিক কাবাব আগুনের উপর ঘোরাচ্ছে ফেরাচ্ছে!—শা-জিরার সুবাস ভোজন-অভিলাষ বাড়াচ্ছে!'

ইংরেজের হোটেলে তো খেতে লজ্জা হয় না! বিদ্যার মা তরল-মতি কন্যাকে ধমক দিয়েছিলেন, 'আই মা কি লাজ!' শূলপক্ক কি সেই রকম যে আমাদের এত লজ্জা?

এইসব নানান কারণে আমি পশ্চিমের এক বড়া ঘরানার ভদ্র-লোকের কাছে সিক্ক-কাবাব শিখে নিয়েছিলাম। নিজে পরিশ্রম কমাবার জন্য উড়ে ঠাকুর এবং চাকরকে বললাম, 'আয় তোদের শিখিয়ে দি।' কেউ রাজী হল না, বলল, 'আমার জাতি যিব!' পশ্চিমেও এই হাল, 'পাঁড়ে যেতনা খুসবু পায় ওতনা লালায়!'

লখনউয়ের এক নবাবের বাউরচিখানা থেকে মন মাতানো গন্ধ পেয়ে এক পণ্ডিত বললেন, 'আজ ময় জাত দেই ডুঙ্গা !'

ঢুকে হেড কুক্‌কে বললেন, 'লেও পাঁচ রুপয়া, ভরপেট পিলাও খিলাও, মিয়া !' বাউরচি মাত্র এক চামচ পোলাও প্লেটে দিল। পণ্ডিত বললেন, 'ভর পেট, ভর পেলেট দেও, মিয়া সা'ব !'

'ইসকো পহলে হজম কিজিয়ে, ময় পিছে বহত ডুঙ্গা।' মিয়া বলল।

খুশি হয়ে বসলেন খেতে। সেটা খেয়েই বললেন, 'হে পরমাত্মা ! বড়ে মিয়া সব্ মে চক্কর। আঁখমে সুঝাই নেই পড়তা ! [মাথা ঘুরছে। অন্ধকার দেখছি।] ই কেইসি সালন কি পোলাও ?' [কি মাংসের পোলাও ?]

ভিসতি, মশালচি মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালতে লাগলো। বাবুরচি বলল, 'এক গহমন [গোখ্‌রো সাপ] দশ টুকরা করকে দশ মুরগী কো খেলায়া যাতা হ্যায়। দুসরি রোজ এক মুরগী ন টুক্‌রা করকে ন মুরগীকো খেলাতে হ্যায়। তিসরি রোজ এক মুরগী কতল করকে আট মুরগীকো খেলাতে হৈঁ। যব এই তরিক্কা সে স্রেফ্ এক-হি মুরগী রহ যাতি উসকো 'সব-দেখ' [কেন্দ্রীভূত] গোস্ বোলা যাতা হ্যায়। উসিকা পোলাও তুম খায়া পণ্ডত !'

পণ্ডত [ইউ, পি, উচ্চারণ] বলল, 'জাত ভি গিয়া বড়ে মিয়া ! পেট ভি নেহি ভরা !'

বউরচি উচ্চ হাস্যে হাত নেড়ে উত্তর দিল :—

গোহুমন বোটি বোটি
নান নান হাম কাটি।
মুরগা মুরগী খায়

চাহে জান রহে যায়!
মোটাই চড়েগা যব
হলাল করেগা তব
পোলাও বনাই হাম
ইস্‌সে তেরা কিয়া কাম?
মোতি চুনি জোন খাওয়ে
উসিকে হজম হোয়ে,
নবাব বাদশাজাদা
শাহজাদী শাহাজাদা
এক-হি চামচ ভর
তবিয়ত গড় বড
গরীব গুরবা খায়
তুরন্ত গুজর যায়!
কিয়া কহো পণ্ডত
গিয়া তেরা জাত?
জান নেহি গিয়া তেরা
ইয়া বড়ি বাত।

ফুট নোট

ফুপা—পিসে; খালু—তালুই; পণ্ডত—পণ্ডিত; রুপয়া—রুপিয়া, টাকা, সর—শির, মাথা; সালন—মাংস, মশালচি—পদচ্যুত মশাল-বাহক যে এখন বাসন মাজে; বোটি—টুকরা; নান্ নান্—ছোট ছোট; মুরগা—কুঁকড়ো, মদ্দা পাখীটা; মুরগী—হেন; মোটাই—fattened state; গুজর যায়—মরে যায় (guzr jai); বড়ি বাত—কপাল জোর; বহত—বহুত, অনেক। হালাল—জবাই।

ষোল আনা

বৈশাখের অপরাহ্ণ। কাঁকনাড়া স্টেশনের নিকট গঙ্গার খেয়াঘাটে পৌঁছে, হালিশহরের পণ্ডিত গঙ্গামজ্জন গঙ্গোপাধ্যায় তর্কবাচস্পতি মশায় ধীর পদক্ষেপে ডান হাতটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাড়তে নাড়তে মৃদু হেসে চীৎকার করলেন : ওরে মাঝি, আমাকে অবিলম্বে চুঁচুড়া পৌঁছে দে বাবা, ষাঁড়েশ্বর তলা যাব। মিথিলা থেকে মহাপণ্ডিত মাঙ্গু মহারাজ এসেছে। সন্ধ্যাবেলা শাস্ত্রীয় তর্ক হবে। তোর আর সব মাঝী কোথা? তোর নাম কি রে মাঝি?'

মাঝি বলল, আমাকে সবাই ফেলু বলে ডাকে, আমার 'ভাল' নামটি কি, আমার বয়স কত, তা কেবল আমার মা জানতেন।

পণ্ডিত : তোর পিতার উচিত ছিল একটা সংস্কৃত নাম রাখা, যেমন উচ্চৈশ্রবা বা উদংষ্টিট্টিভ। তাঁর বোঝা উচিত ছিল নৌকাতে তোকে তর্কালংকার তর্কবাচস্পতি ও বিদ্যাবিনোদদের সামনাসামনি হতে হবে।

ফেলু বলল, আজ রবিবার হাপসের বাবুরা কেউ পার হবে না; পণ্ডিত মশাই চড়েন, আপনাকে একলাই পার করবো; নেয়ের কাজই তো এই। আমার ছেলে নেলু মাতলায় ঘাটমাঝিদের একটা ভোজ খেতে গেছে, আজ আসে নেই, হাল ধরে সে। চড়েন, ফেলু একলাই এক শ। দু নৌকয় দু পা রেখে পার হয়ে গেঁওখালি গিছলাম। সাঁতারেও ছাড় কোশ পাড়ি দি।

পণ্ডিত মশাই বললেন, গুমোট গরম রে মাঝি, পাতাটি নড়ে না।

ফেলু বেয়ে বেয়ে পণ্ডিত মশায়কে পারে নিয়ে চললো।

পণ্ডিত মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, ওরে মাঝি, তোর মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে? খুব ঘৃত, দুগ্ধ, দধি খাবি। ঘৃততে মস্তিষ্ক তেজী হয়; তন্ত্র পুরাণ বোধগম্য হয়।

মাঝি: আর পণ্ডিত মশায়, চারটে বেজে গেল এখনও আমার অন্নপ্রাশন হয় নেই। ঘিএর পয়সা কোথা পাব?

পণ্ডিত: ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। দুগ্ধ ও দধি ধার করে খাবি। দধ্না চিপিটকং খাদয়। তোমার মাথা ন্যাড়া কেন?

মাঝি: আমার যে মাতৃহরণ হয়ে গিয়েছে, পণ্ডিত মশাই, এখনও ব্রাহ্মণ ভক্ষণ বাকি।

পণ্ডিত: তোর কথা ভাষাচার্যের মতো নয় মাঝি। আরো বিদ্যা চর্চা কর; সব দেশের লোকের পূজা পাবি। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। শকুন্তলা, কাদম্বরী, ভট্টি, কুমার, রঘু পড়েছিস মন দিয়ে? আর মনে রাখিস সংস্কৃত হচ্ছে স্বর্গে যাবার আসল খেয়া ঘাট। ভবতরণ ভবপারে নিয়ে যান। তিনি ভিন্ন গতি নেই। শ্যামা-দন্যো নহি নহি প্রাণনাথো মমাস্তি। সংস্কৃত কতদূর পড়েছিস?

মাঝি: সংকীত্তন জানি না পিরভু, সাঁতার জানি আর একটা গান জানি,

ঈশান কোণে গোল বেধেছে
বাতাস বয় সোঁ সোঁ
নৈঋতে ম্যাঘ ছেয়ে গেছে
করতিছে গোঁ গোঁ।

পণ্ডিত: সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় অধ্যয়ন করেছিস? এ সব না পড়ে

থাকিস তো তোর জীবনের চার আনা ডুবলো। তুই বোকার মতন আকাশে তাকিয়ে কি দেখছিস?

মাঝি: 'ন্যায়' 'অন্যায়' 'বেদানা' বুঝি না পণ্ডিত মশাই; গরীব মানুষ রোজ আনি রোজ খাই। অনেকক্ষণ তামুক না খেয়ে প্যাটটা কেমন এক রকম টিস মেরে আছে! তামুকের দোকান বন্ধ ছিল। দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে হেঁপিয়ে গেলাম।

পণ্ডিত: ওরে মাঝি! তুই আমার ঋগ্বেদ সংহিতার টীকা পড়েছিস? কেমন হয়েছে রে ফেলু? ভাটপাড়া হালিশহর শান্তিপুর অবাক। মিথিলারও তাক্ লেগেছে। দিগ্‌গজ পণ্ডিত মায় মহারাজ আমার নাম শুনে এসে হাজির। তুই মীমাংসা, দর্শন, অলংকার, তন্ত্র, সিদ্ধি, অদ্বৈতবাদ পড়েছিস্?

মাঝি: আমার কাঁঠালগোড়ে বাড়ি পণ্ডিত মশায়, সিদ্ধি ভাং খাইনে, তামুক টিকে কিনি বটে। কাঁঠালগোড়ের দা-কাটা তামুক মিষ্টি কি! ও সব শাস্তর টাস্তর সেখানে পাওয়া যায় না। হাটে কেবল বিড়ে বাড়ন কলকে কলসী বিক্রি হয়।

পণ্ডিত: তবে তোর জীবনের আট আনা ডুবলো! তুই আড়ংঘাটার মহামহোপাধ্যায় মশায়কে চিনিস? তোর কজন কাব্যতীর্থের সঙ্গে আলাপ আছে রে ফেলু? কজন বেদান্ততীর্থের সঙ্গে তোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে? তুই স্মৃতি, কলাপ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নৈষধ, যোগশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পড়েছিস? না কেবল জলে সাঁতার দিতেই শিখেছিস? সংস্কৃত কি নিধি জানিস, এর গুণে সাঁতরে ভবসাগর পার হন পণ্ডিতরা, তোর খেয়া তুচ্ছ রে!

মাঝি: পণ্ডিত মশাই আমরা গঙ্গাসাগরে শুটকি মাছ দিয়ে ভাত

খেতাম। নৌকো দেখাশোনা, তামুক সাজা, চকমকি ঠোকা, ছিচকে দিয়ে নলচে সাফ করা, এই সব কাজেতেই রাত হয়ে পড়তো. ল্যার্কা পড়ার সময় হত না। সময় পেলে কি আর এমন নিধি হাত ছাড়া করি ?

পণ্ডিত : 'তবে তোর জীবনের বারো আনা ডুবলো !'

বিজলী কটাক্ষ হানলো। তুমুল তুফান ! হুগলী তীরে দোল খেয়ে বট অশ্বত্থ রসাল তেঁতুল বৃক্ষশ্রেণী ধুলো উড়িয়ে কালবোশেখীর ভাষণ 'রি লে' করল। প্রকৃতির রেডিও সেট আসর জাঁকিয়ে দিল। নদী-সৈকতে জল আছাড় খাচ্ছে। গঙ্গাবক্ষ অন্ধকার, নৌকা বন বন ঘুরছে, আকাশবাণী মন্দ্রে মন্দ্রে মেঘ থেকে। মাঝি রণমত্ত ঝঞ্ঝা ভেদকরে উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, পণ্ডিত মশাই, সাঁতার জানেন ? জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে পণ্ডিত মশাই বললেন, ওরে না রে ! না রে। কেন রে ?

মালকোঁচা এঁটে জলে ঝাঁপ দেবার সময় ফেলু চীৎকার করলো, 'তবে আপনার জীবনের ষোল আনাই ডুবলো।'—ঝপাং !

১৩৬১

মাসী-পিসী ডাক্তার

এখনকার মেডিকাল এটিকেট ও স্টানডার্ড একদিনে গড়ে ওঠে নি। এর ইতিহাসে নানাবিধ চিত্র শোভা পাচ্ছে। ১৮৩৫ সালে মেডিকাল কলেজের সৃষ্টি। পাস করে ছাত্রদের অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হল। কত আশা ভরসা এবং কুসংস্কারও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল; যাঁরা সরকারী চাকরী পেলেন শীঘ্রই উন্নতি করলেন।

বিলেতে উইচক্রাফট ইত্যাদির মত এ দেশেও ঝাড় ফুক্ জড়ি বুটি সাধু সন্ন্যাসী, 'কোমরের ব্যাতা ভাল করি, সিঙ্গি লাগানে 'রো বৈদ' ফেরিওয়ালা চিকিৎসক ছিল। এ সব আজও যায় নি কারণ গরীব লোক ডাক্তারের ফি দিতে পারে না। আর ইউনানী হোমিও আয়ুর্বেদ তো চিরকাল থাকবেই। ডাইন প্লেগ আনত। খুব বুড়ীকে লোকে ডাইনী ভেবে মারত। মনে করত ওর জন্যই পাড়ায় লোক মরছে। তেলপড়া দিয়ে রোগের চিকিৎসা হ'ত। রোগী তেল আনত, তাতেই মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেওয়া হ'ত। কুমড়োর ডাঁটা দিয়ে দাঁতের পোকা বের করা হ'ত। এখনও রাস্তায় বেদে স্ত্রীলোক হাঁকে, 'দাঁতে পোকা বের করি।' কেউ পড়ে গেলে সেই স্থানে ওঝা সাতটা লাথি মেরে চলে যেত, ব্যথা ভাল হ'ত। রোজাদের বেশ রোজগার ছিল।

এতগুলো প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মেডিকাল প্রফেশনকে মল্লযুদ্ধ করতে হয়েছে। অনেক রকম আকার ধারণা করতে হয়েছে, তবে এখনকার মসনদে বসেছেন। এই বিগত ঘটনা শ্রবণ-মনোহর বলে বোধ হয়।

একজনের গুরুপুত্র ডাক্তারি পাস করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরুগিরি ছেড়ে কোট প্যাণ্টে কি বেশী রোজকার হবে?' গুরুপুত্র পকেট থেকে এক গোছা মাদুলি বের করে দেখিয়ে বললেন, 'এতেই আমার এখনও পেশেণ্টের বাড়ী বেশী রোজগার।'

রোজা, ওঝা, বেদে আনাড়ী হলেও লোকে নূতন ডাক্তারকে 'সাক্ষাৎ যম' বলত। এক শ পেশেণ্ট না মারলে তাঁর এক্সপেরিয়েন্স হবে না। কেউ মরলে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করতেন, 'কোন ডাক্তার মেরেছে?' বড় পোলাইট হলে আত্মীয় উত্তর দিতেন, 'ডাঃ অমুকের হাতে মরেছেন।'

সেদিনকার কথা, মাত্র ৫০ বছর পূর্বে এক ডাক্তারের মৃত পেশেণ্টের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হয়েছে। তিনি গেলেন না। জিজ্ঞাসা করলাম, নিমন্ত্রণে গেলেন না কেন? হেসে বললেন, সেদিন এক শ্রাদ্ধে গিয়েছিলাম। সভায় বসে দেখি, নবাগত ব্যক্তি একে একে আসছেন ও গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন, কোন্ ডাক্তারের হাতে মরেছেন, কোন্ ডাক্তারের হাতে মরেছেন? গৃহস্বামী আঙ্গুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলেন প্রতিবার!

আর এক ডাক্তার যদি গাড়ি করে মৃত ব্যক্তির বাড়ির পাশ দিয়ে যেতেন তাহলে তার বৃদ্ধা বিধবা ডুকরে কাঁদতো, ঐ গো ঐ তোমার যম যাচ্ছে গো।

নাপিত, জেঁাক-ওয়ালা, ব্যাংওয়ালা, 'সিঙ্গি' (cupping glass) ওয়ালা বিবিধ চিকিৎসা প্রথার সাহায্য করত। ব্লাডার কিছুতেই খালি করতে না পারলে জ্যান্ত ব্যাং ন্যাকড়া করে নাভিকুণ্ডে ধরলে ব্যাং যখন কিলবিল করে উঠতো তখন ব্লাডার খালি হয়ে যেত।

ঘোড়ার রক্তখেকো 'ঘোড়েইলী' জোঁক বিক্রি করে ইডন-হসপিটাল্ স্ট্রীট্ তিমল রাম জোঁকওয়ালা বেশী রোজকার করতো। বিলেতে ডাক্তারকে ইয়ারকি করে leech বলে, এবং ডাক্তারিকে leechcraft বলে। অন্যান্য professionও (যেমন আইন) জনসাধারণের এবং কবিদের ব্যঙ্গ এড়াতে পারে নি।

এখনও pulse specialist ভদ্রলোক আছেন। ডাক্তার নন কিন্তু লোকে তাঁকে দিয়ে একবার নাড়ীটা টিপিয়ে দেখে, যদিও বিচক্ষণ ডাক্তার চিকিৎসা করছেন। এঁর অন্যান্য গুণও আছে। রোগীকে দেখে বলেন, বাঁচবে না, দাঁত দেখা যাচ্ছে। অথবা, বাঁচবে—তামুক খেয়েছে। রোগীকে এর কাছে এনে আত্মীয়রা বলেন, দাদুর পায়ে তোর মাথাটা একবার ঘসে নিয়ে যাই।

একটা পুরনো গল্প শুনে থাকবেন যে এই রকম একটি সেকেলে পদ্ধতির চিকিৎসক রোগীর বাড়ী নাড়ি টিপতে গিয়ে বললে, নাড়ি ভার, ইক্ষু রস খেয়েছ? সকলে অবাক হয়ে গেল। পরে তার শিষ্য জিজ্ঞাসা করলে, কি করে জানলেন? গুরু উত্তর দিলেন, খাটের তলায় ছিবড়ে দেখেছিলাম।

শিষ্য একদিন নাড়ী টিপতে গেছে। খাটের তলাটা দেখে নিয়েছে আগেই। নাড়ী টিপে বললে. আজ গুরুপাক খেয়েছেন দেখছি—জুতো।

কোন কোন ডাক্তার উগ্রস্বভাব তা পাড়ার রোগীদের জানা ছিল। এক বৃদ্ধ পেশেণ্ট এরকম একটি ডাক্তারকে নিজের অনেক রোগের ফর্দ দিলেন। ভাবলেন ঔষধ না থাকে কড়া কড়া কথাতেই উৎসাহ ও শান্তি পাবেন। বিনিয়ে বিনিয়ে বললেন—'আর ডাক্তারবাবু, আমার পেটের

পিলেটা কামড়ায়—আর জিভ শুকোয়—ও মা। আমার হাতে ব্যাতা ডাক্তার মশায়।

ডাক্তার বললেন, 'পিলে তো পেটেই থাকে, আর জিবে বেশী জল ভাল নয়। সেটা পেটুকের লক্ষণ। বুড়ো হলে সকলেরই হাতে বাত হয়।

পেশেণ্ট—ডাক্তারবাবু, আমি কবে সারবো ?

ডাক্তার বলেন,—আমি ডাক্তার, গনৎকার নই।

পেশেণ্ট বললেন—ছেলেবেলায় সেণ্ট ভিটস ডান্স হয়েছিল।

ডাক্তার বলেন—ও নাচন কোঁদন তো ছেলেবেলাই ঘটে থাকে। আর কি হয়েছিল ?

—ডাক্তারবাবু আর হয়েছিল বেরি বেরি, ডারবিশর নেক, ক্লারজিম্যানস থ্রোট, আসাম ফিভার, নাগা সোর, হুক ওয়ারম, কালা-আজর, টেপ ওয়ারম, ধোবিজ ইচ, বারবার্স একজেমা, ক্যালকাটা কফ, দিল্লী বয়েল,—

ডাক্তার বললেন—একটা চার ফুট লোহার সিক কাছায় গুঁজে কাল-বোশেখীর সময় রাস্তায় বেড়াবেন। সব রোগই তো হয়ে গেছে, এখন বজ্রপাতটাই বা বাকি থাকে কেন ?

যাঁরা ধমক খেতে ভালবাসেন সেই পেশেণ্টরা এই রকম ডাক্তার কবিরাজ পছন্দ করেন, ধমক ও মার রোগের ঔষধ, আফিং খেয়ে বেহুঁশ হলে মোটা দড়ি দিয়ে পেশেণ্টকে মারা হয়। বহুকাল পূর্বে বসন্ত হলে চাবকে দিত। এরকম ডাক্তারদের বেশ প্রাকটিস ছিল ও পেশেণ্টরা ভয় ভক্তি করত।

আরও যে রোগীরা 'সিমপাথি' ভিন্ন রোগ উপশম হয় না ভাবত, তারা 'মাসী-পিসী' ডাক্তারের কাছে যেত। এই ক্লাসের ডাক্তাররা

দয়ার সাগর ছিলেন। রোগী যখন বলছেন, সমস্ত রাত্রি অম্লশূলে ছটফট করি ডাক্তারবাবু—তখন ডাক্তার কাতর চোখে তাঁর পেশেন্টের দিকে তাকিয়ে বলতেন—আ-হা হা! তুৎ! তুৎ। তুৎ! মরে যাই! কত কষ্টই পেয়েছিলে রাত্রে! আচ্ছা আমি একটা মিকশ্চার—

—মিকশ্চারে সারবে না ডাক্তার বাবু, আত্মহত্যা করতে হবে, কাল রাত্রে একটা মোটা দড়ি পেটে বেঁধে ঝুলে মরতে গিয়েছিলুম, বউ এসে বাধা দিল।

—পেটে বেঁধে! সে-কি রকম সুইসাইড?

—আমার গলায় যে লাগে ডাক্তারবাবু!

সেকালে সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন না কাজেই মাসী-পিসী ডাক্তাররা হতাশ রোগীদের মনে উৎসাহ দিতেন। একটি মাসী-পিসী ডাক্তার দু টাকা ফি নিয়ে ৭০ বছর পূর্বে পশ্চিমে এক রাজধানী শহরে আঠারো লক্ষ টাকা জমিয়ে গিয়েছিলেন। আমারও চিকিৎসা করেছিলেন। এ সব দেখে ডাক্তারি ইতিহাসে কারও অনুরাগ আশ্চর্য নয়।

এই ডাক্তারকে আমি বিশেষ করে জানতাম। মুখ মিষ্টি গুড়। কড়া কথা কাকে বলে জানতেন না। তিনি এক বিখ্যাত রাজার চিকিৎসা করতে এলেন। ছোট কাগজে প্রেসক্রিপশন লিখলেন, সেটা ঔষধের বোতলে আঁটা হল। রাজা দেখলেন, হাঁ কায়দা বটে। তাঁর হরদম ভয় পাছে শত্রুরা কিছু খাওয়ায়। ভাবলেন এ বোতলে বাঙ্গালী ডাক্তার যা দিয়েছেন তাই লিখে সেঁটে দিয়েছেন। অবিশ্বাসের কারণ নেই, ডাক্তারকে বললেন, বাঙ্গালী, নরস দাও। ডাক্তার নিজে হাতে ওষুধ খাইয়ে, সিলকের রুমালে মাসীর মতন রাজার মুখ দাড়ি মুছিয়ে দিলেন। রাজাদের সেবা করবার বিশ্বাসী আত্মীয় প্রায় থাকে না, এ রকম

ডাক্তারকে তাঁরা মাসী-পিসীর মতন দেখেন। একটা রাস্তা ভাল হলে সকল রাস্তাই 'কল' দেবে। রাতারাতি আঠারো লাখ। অন্যের কাছে সেই দু টাকা; গরীবের মা-বাপ। ফি বাড়ান নাই।

একটি 'মাসী-পিসী' ডাক্তার হতাশ রোগীকে নিজের গাড়িতে তুলে নিলেন, বললেন, 'হাসপাতাল দেখবে চলো।' সমস্ত ওয়ার্ড বেড়িয়ে তাঁকে দেখালেন। একটা রোগীর পা ধরে টানছে সার্জন, রোগী প্যা করে কাঁদল। একজনের ব্যাণ্ডেজ খুলছে, সে চ্যাঁ করে চেঁচাল। কারু চোখ বাঁধা, কারু মাথা বাঁধা, সকলেই প্রায় চলৎশক্তি রহিত। হাসপাতাল থেকে দু ঘণ্টা পরে দু জন বেরিয়ে এলেন, গাড়ি চড়লেন।

পেশেণ্ট বললেন, ডাক্তারবাবু, কি ভয়ানক সব রোগী দেখলাম! হে ভগবান।

—তাহলেই দেখুন, ডাক্তার বললেন, আপনি ওদের চেয়ে কত সুস্থ ও বলবান। আর রোগ রোগ করে অধীর হবেন না।'

পেশেণ্টের মুখে এক গাল হাসি। বললেন, ঠিক বলেছেন, আমি তো অনেক ভাল, খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি! আমাকে আজ যথার্থ ভাল করেছেন ডাক্তারবাবু।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে কলকাতার এক বিখ্যাত জেনারেল প্রাকটিশনার আমাকে পেশেণ্টের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি যে সেকালের মাসী-পিসী' ডাক্তারের গল্প কর ঐ দেখ এখনও একজন বর্তমান। ডাঃ অমুক পেশেণ্টের ওডিকোলোনের মাথার নেকড়াটি কেচে দড়িতে শুখুতে দিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু এলেই রূপোবাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেতেন, গল্প করতেন। ডাক্তারেরসঙ্গে গল্প এখন তো আশ্চর্য জিনিস। অসময়ে

ডাক্তার আনাতে হলে ভাড়া গাড়ি ডাকা হত। গাড়োয়ান যদি শুনতো ডাক্তার আসবেন ও ফেরত যাবেন তা হলে বলত, বাবু, ও ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ তামুক খান, বেশী ভাড়া দিতে হবে। এখন পেশেন্টের বাড়ি কিছু খেলে ডাক্তারের ডিগনিটি যায়। তবে অনেক দূর থেকে ডাক্তার আনতে হলে ভয়ে ভয়ে আমরা কিছু রিফ্রেশমেণ্ট দি পশ্চিমের গ্রামে। লেমনেড, চা ইত্যাদি।

বিলেতেও সেকালে 'মাসী-পিসী' ডাক্তার ছিলেন। তাঁদের sympathyর কথা 'Diary of Late Physician' পুস্তকে পাবেন।

পঁচাত্তর বছর পূর্বে হোম করে ঘি পুড়িয়ে, পুরুত-গনৎকারকে টাকা ঢেলে যখন আমার জ্বর ছাড়ল না, তখন ইংরেজ সিভল সার্জন দেখতে এলেন। ইনিও মাসী-পিসীর মতন আমাকে পিঠ থাবড়ে আদর করলেন, 'ওঅট এ ডার্টি লিটল্ নেটিভ বয়।'

আমার failed B. A.র মতন 'নেটিভ ডক্টর' সরকারী উপাধি ছিল, মাহিনা ৬০ টাকা; আসিস্টাণ্ট সার্জনের নীচে [২৫০৲]; পরে বদলে 'হসপিটাল আসিস্টাণ্ট' হ'ল। পরে 'সিভল্' যোগ হ'ল।

হাকিম আজমল খাঁ মাসী-পিসী ডাক্তারের ওপর উঠেছিলেন। এক বড় মানুষের বাড়ি রোগী দেখে আড়াই শ টাকা ফি নগদ থলেতে হাতে নিলেন। রাস্তায় তিনি গাড়ি চড়তে গিয়ে দেখলেন হাত জোড় করে একটি লোক দাঁড়িয়ে। সে বলল, গরীব কা আওরত কা বিমার হ্যায়। হাকিম সাহেব তাকে দেখলেন, বললেন, আনার কো রস দেও। লোকটা বলল, বড়া গরীব হ্যায়, কাঁহাসে এতনা আনার মিলে। আজমল খাঁ আড়াই'শ টাকার থলে তার হাতে দিয়ে রুমালে চোখ মুছে গাড়ি চড়লেন।

পশ্চিমে এক শহরে শিওরাম বৈদ্য তাঁর রোগী মরলে কাঁদতেন। লোকে এখনও বলে, শহর উপর শিওরাম বৈদ। লাট সাহেব, রাজা বাদশারও উপর।

কথায় বলে, আহা বলবার কেউ নেই। রোগীর সিমপ্যাথির বড়ই আবশ্যক, এটা একটা ঔষধ।

বাংলাদেশেও এই রকম দয়ালু কবিরাজ অনেক ছিলেন। এক এক ভদ্রলোক কবিরাজের গুণে মুগ্ধ থাকতেন। একবার শাস্ত্র ব্যাখ্যা হচ্ছিল কলকাতায়, অনেক লোক শুনছিলেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁর এই গুণ ঐ গুণ ইত্যাদি। শুনে নৈহাটীর একটি ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের জনার্দন কবিরাজও কম নন।

অনেক বিপন্ন লোক জ্যান্ত ভগবান চান। ডাক্তার তা সাজতে রাজী নন বলে সাধু, সন্ন্যাসী, দৈবজ্ঞ, গুরু অবাধ ক্ষমতা পেয়ে থাকেন।

কৃষ্ণ পিঠে হাত বুলিয়ে কুঁজ ভাল করে দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ; এবং যীশু গ্যালিলী তীরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে লোকদের নানা প্রকার রোগ (মায় কুষ্ঠ) আরোগ্য করেছিলেন—এন-টি সেণ্ট ম্যাথু চার। পশ্চিমে ডাক্তারকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যদি, ই বাবা সে আচ্ছা হো জাবে? ডাক্তার আকাশে আঙুল বাড়িয়ে বলেন, ইনশাল্লা। (ভগবান ইচ্ছা করলেই ভাল হবে)।

আর এক ডাক্তার ঔষধ দিয়ে বললেন, ভগওয়ানকে নাম লেকে এক খোরাক পিজিয়ে। রোগী বললেন, দবা কি কেয়া ফায়দা তব?

ডাঃ লিউকিস ১৯০৭ সালে একটা সাহেব পেশেণ্টের হাতে মাদুলি বাঁধা দেখেছিলেন। পাটনার একটি সাহেব গঙ্গামায়ীকে রোজ নমস্কার করত। বহুবাজারের ফিরিঙ্গী কালীকে অনেক সাহেব মেম পূজা

পাঁচান্ন। মারোয়াড়ী হাসপাতালে রোগীদের উপাসনার জন্ত লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির আছে। দেবতা ও চিকিৎসার একীকরণ বহুকাল থেকে বহু দেশে চলে আসছে। এখন 'সাইকিয়াট্রিস্ট'রা সান্ত্বনাদান 'সায়েনটিফিক' করে দিয়েছেন। স্নেহ দেখাবার দরকার হয় না।

মাসী-পিসীর মতন বাড়াবাড়ি স্নেহ দেখালে 'প্রফেশনের' গুরুত্ব থাকে না। অবিবাহিত রোগিনী রাত্রি দশটায় টেলিফোন করছেন, হ্যালো। ডাক্তার, আমার ঘুম আসছে না। অবিবাহিত ডাক্তার উত্তর দিলেন, আচ্ছা, আপনি যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি একটা ঘুমপাড়ানী গান গাই।

১৩৬১

সেকালে গ্রাম্য পূজা

সত্তর বছর পূর্বে যখন আমাদের গ্রামে পৌছুলাম তখন পূজার কিছুদিন দেরী আছে, কিন্তু বন্দোবস্ত প্রায় ষোল কলা পূর্ণ। গ্রাম গম গম করছে।

মেঠো ঘাস-গজানো রাস্তায় বেশ লোকের চলাচল বাড়ছে, চিতে বাঘ পালিয়েছে, রাঙ্গা নীল দেশালাই জ্বেলে ছেলেরা রাস্তা আলো করছে, মেয়েরা গান করছে :—

> নতুন ধুতি পর্ রে খোকা
>
> দোলায় আসে ঈশানী,
>
> ঘরে এল শ্যামা পোকা
>
> গাছে দুগ্ গো টুনটুনি।

আমার বয়সী ছেলেরা রাস্তায় পায়জামা পরা আমাকে দেখে বুঝে নিল যে এটা বিদেশী আমদানি। আমাকে খেপাতে লাগলো, "হাঁদুদের দুগ্ গা পূজা, উপরে চ্যাকোন চিকোন ভিতরে খড়ের বোঝা!"

একটাও মৈথিল ছড়া মনে পড়্ লো না যে পাল্টা শোনাই। আমার বাবার কাছে শেখা উলোর বাঙ্গালে ছড়া মনে পড়ে গেল। চিৎকার করলাম—

> সত্যপীর বলেন আমি
>
> শিন্নি নাহি খাবো
>
> হাল্‌সে চাচা এসে বলেন
>
> পীরের মুঁয়ে গেদেঁ দিবো
>
> মানিক পী-ই-ই-র!

তখন দুই ধর্মে মিলনের ধুম পড়ে গেল, তারা যাত্রা বাইনাচ দেখতে এসেছে, গাছ তলায় রাত্রে পড়ে থাকে, দোকানে খায়। গ্রামে প্রায় চার হাজার আগন্তুক। যাত্রা,—মতিরায়ের পূর্বে যিনি বিখ্যাত ছিলেন তিনি বৃহৎ দল নিয়ে এসেছেন। তাঁর নাম মনে পড়ে না।

এক ম্যানেজারের হাতে আসল পূজা, আর এক জনের জিম্মায় যাত্রা, বাই নাচ, খেমটা নাচ; আর একজনের ভার বলিদানের প্রসাদ বিতরণ,—ঝকমারি কাজ এটা; আর ছেলেপিলে সব কর্মী।

বাঙ্গালী সাধু দুই বা চার এসে গেছে; এদের অঙ্গে বাঘছাল, শিবের পোশাক। এক জন গাইছে :—

শঙ্করি!

আর গাঁজা খাব না খাব না মনে মনে করি;
একবার গাঁজায় টান,—হাতি আন
ঘোড়া আন পালকি আন চড়ি!
বম বম বম বম শিব শিব করি।

পূজাকমিটি চান না যে এই ব্রাহ্মমূহূর্তে কারও বিয়ে বা ছেলে হয় আর ভিন তালে বাজনা বাজে কিন্তু তৃতীয়ার দিন হঠাৎ বেসুরো বাজনা বেজে উঠলো—

টাকাটা সিকেটা, টাকাটা সিকেটা
নিদেনে দোয়ানী!

হেমা পাগলা বলে উঠলো, "ওরে ঝগড়া বেধেছে! বাজনদাররা খেপেছে—কোকলা মহেশের প্রথম খোকা হয়েছে, বাজনা শুনে পয়সা দেয় নি।" ঠিক পাওনা না পেলে ঢুলীরা পূজাবাড়িতেই বিদ্রোহের বাজনা বাজাতো।

ছুটলাম সেকালকার পোশাকে,—মালকোচা মারা ধুতি, গায়ে পিরান; দলে প্রায় কুড়িটা ছেলে, দশটা মেয়ে "গাছ কোমর" বাঁধা সেকেলে শাড়ি, নাকে নোলক, কানে এক কান মাকড়ি। বয়স সকলেরই কম বেশী দশ। হেমা পাগলা দলের গোদা ছিল। সে যা বলতো, আমি তাই, শুনতাম। ঝুঁপোদাসী নামে পাড়ায় এক কুৎসিত কুঁচুলী মেয়ে ছিল। হেমা বললে, "এই তুই চেঁচিয়ে বল—

ঝুঁপো দাসী
প্রাণপ্রেয়সী।"

ঝুঁপোকে দেখে যেমন আমি এটা বললাম মেয়েটা একটা ইট ছুড়ে আমাকে মারল। বেঁচে গেলাম! কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হেমা পাগলা বললে, "পূজায় উলোয় কত আমোদ দেখেছিস? তুই তাড়াতাড়ি মুগের যাস নি।" হেমা পাগলার রং হুঁকোর খোলের মতন, পেটটি ডাগর, তাতে কাটি দিয়ে ঢোল বাজায় আর মুখে সুর করে—

দাসপুর গুরুদাসপুর!
দাসপুর গুরুদাসপুর!

তার এত সুরের জ্ঞান যে যেখানে গোলযোগ বেধেছে বাজনা শুনে বুঝে আমাদের নিয়ে যেত। পূজা শুরু হয় ঝগড়া ঝাঁটি নিয়ে। সব তামাশাই পূজার অন্তর্গত। মারমিট পর্যন্ত।

ফোকলা মহেশ বাজনদারদের বলছেন, "তোরা আমার খোকা হয়েছে বলে তিন দিন বাজিয়েছিস। তিন দিন খেয়েছিস, তামুক-টিকে দিয়েছি, বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়েছিস বারান্দার ভাড়াটা, সব কাটাকাটি করে, আমার পাওনা রইল তিন টাকা। যাক্ সেটা আর আমি

গরিবের কাছে চাই না,—আবার যখন আমার খোকা হবে, অমনি বাজিয়ে যাবি!"

পূজার যাবতীয় সামগ্রী রেলে, রেলের পূর্বে নৌকায়, কলকাতা থেকে উলোয় আসতো, ৫০ মাইল। মোমবাতি বা চর্বিবাতি চালু হবার পূর্বে রেড়ির তেলে দেওয়ালগিরি, "গেলাস" ইত্যাদি জ্বালা হ'ত। আখের সঙ্গে প্রথম মোমবাতি কলকাতা থেকে এল। খাবার জিনিস মনে করে আখের মতন বঁটি দিয়ে টুকরা টুকরা কেটে একজন খেয়ে থু থু ক'রে ফেলে দিলেন। মা দুর্গাকে এ অখাদ্য দেওয়া হবে না। পর বৎসর ইনডেণ্ট পাঠাবার সময় এজেণ্টকে উলোর ভাষায় লেখা হল:—"হাদা হাদা হুম্বা হম্বা তার ভিতরে হুদো পোরা, তারে কি কয়? তার মিষ্টতা কম, আর পাঠাইবেন না।"

আবার এক ঝগড়া বেধে উঠল। যিনি হনুমান সাজবেন তাঁকে সকলে বলল, "কুণ্ডু মশায়, আপনার দুই পুত্র এখন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট, তারা যাত্রা শুনতে আসবে, আপনার হনুমান সাজা হবে না, ভাল দেখায় না!"

রামপরায়ণ কুণ্ডু মশায় বললেন, "ছেলে ডেপুটি' তা বাপের কি? ওরা কি আমাকে একটা সোনার লেজও করে দিয়েছে না কি?—হাবাতের ব্যাটারা!"

যাত্রার দিন বুড়োকে একটা নিকটের ঘরে চাবি দিয়ে রাখা হ'ল। যে নূতন হনুমান সাজল সে বড় লাজুক, কথা বেরোয় না। সীতা যখন হাঁকছেন, "বাছা হনুমান! বাছা হনুমান!" নূতন অ্যাকটর চুপ করে রইল, কিন্তু কুণ্ডু মশায় তাই গরাদে দেওয়া খোলা জানালা দিয়ে ওঁদের ঘরে "হুপ! হুপ!" গর্জন করে দুপ দাপ করে বেড়ালেন। একেই "এমপাথি" বা সমানুভূতি বলে। বিলাতি অ্যাকট্রেস Barbara

সমানুভূতির জন্য বিখ্যাত ছিল। নিজে ভাবতো আমি অমুক, আর অ্যাকটিং সুন্দর হতো।

এর পূর্বে আরো বড় বড় বিপত্তি মুস্তোফী বারোয়ারী কমিটি বুদ্ধির প্রাখর্যে ও প্রত্যুৎপন্নমতিতে অবাধে পার হয়েছিল। মহারাজা শিবচন্দ্র নিমন্ত্রিত হয়ে হাতি থেকে নামলেন। পূজার আসরের জাঁকজমক দেখে বললেন, "এ যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার দেখছি!" পূজার প্রধান পাণ্ডা হেসে নির্ভয়ে বললেন, "এ দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বড়!" মহারাজা অপমানিত বোধ করে বললেন, "কি আস্পর্ধা তোমার! আমার কথার উপর টিপ্পনী? ফিরে যাই,—হাথি লাও মাহুত!" পাণ্ডা জোড়করে বললেন, "আজ্ঞে মহারাজ, দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নি।" মহারাজ শিবচন্দ্র হো হো হেসে পাণ্ডার পিঠ থাবড়ে বললেন, "এতোও জান তোমরা!—চলো!"

নৈবেদ্য ফলমূল অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বিধবা গিন্নিরা কাটতেন। ভোর বেলা চূর্ণি নদীতে বা পুকুরে চান করে মট্‌কা গরদ তসর পরতেন। সূতী কাপড় অপবিত্র। যাঁদের মটকা ছিল না তাঁরা এক একটি বৃহৎ-স্থূর্প আড়াল দিয়ে বসে রসাল শ্রীফল কদল কাটতেন। মহামহোপাধ্যায় দীননাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সেই পুরান কোঠায় সেইদিন একবার যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বড় দরজায় একটি বিধবা প্রহরিণী আমাদের বাধা দিয়ে, বললেন, 'ও ভটচাজ্যি মশায়, ও বাবা ছিষ্টিধর, ও দিকে যেতে নেই, গিন্নি-বান্নিরা নৈবিদ্যি তৈরি করছেন।"

"ওঃ ঠিক, মনে পড়েছে," মহামহোপাধ্যায় বললেন।

প্রহরিণী বললেন, "আপনারাই তো ব্যবস্থা দিয়েছেন যে, নিষ্ঠা—"

"নিষ্ঠায়াং দেবী প্রসন্না ভবতি!" ভট্টাচার্য মশায় বাধা দিয়ে বলে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন।

রক্তলোচন কামার ৫২ বলি দিয়ে যখন রক্তগঙ্গা বহাত, অনেকে মহিষ বলি দেখে ধপাধপ পড়ে মূর্ছা যেত। রক্তাক্ত মহিষমুণ্ড মাথায় নিয়ে যখন হারাধন মুস্তোফী "গিজা গিজা নাক টুপ টুপ" বাদ্যের তালে তালে নাচতেন এবং পরে মুণ্ড ফেলে দিয়ে রক্তলিপ্ত কামারকে মাথায় তুলে নিয়ে "গিজতা গিজোড়" তালে নাচতেন, ও তাঁর শোণিতপ্লাবিত দেহ যখন মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পরে পড়ে থাকতো তখন সেকালে লোকে এই চণ্ডীমণ্ডপকে মহৈশ্বর্যময় স্বর্গলোক ভাবতো।

"চল্ রে একবার ভণ্ড ঠাকুরদাকে দেখে আসি," হেমা পাগলা বললে। দাশরথি রুদ্র (৯০ বা ৯৫) সরকারী ঠাকুরদা। শাক্ত বটে, দুর্গাভক্ত, কিন্তু বলিদানকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তিনি কাণা, কিন্তু কানে নেকড়া গুঁজে বসে আছেন নিজের বৈঠকখানাতে পাছে ছাগলের আর্তনাদ কানে যায়। বলিদানের বাজনা ঢাকবার জন্য উলোর বাঙাল গায়ক মৃদঙ্গ বাজিয়ে গান করছে—

একবার দারাও দারাও দারাও হরি
বামে লয়ে রাই কিশোরী
. ...
শ্যামসুন্দর চ্যাকন কালা
নয়নে আর হ্যারবো না
যৈবনে আর ছ্যাখ্‌বো না।

আর বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে নবাগতা গুটিকতক বালিকা মাঝে মাঝে হারমনিয়মের সঙ্গে বলিদান-ঢাকা গান গাচ্ছে :—

বাঁশড়ি তানে আমি
মড়ি যে মড়ি !

বিসর্জনের বাজনা বাজতে লাগলো। পুরুত ঠাকুরদের কাজ প্রায় শেষ। দুর্গাকে তোলবার পূর্বে একরকম তাল, চুর্ণিতে বয়ে নিয়ে যাবার সময় আর এক রকম। হেমা কাঠি দিয়ে পেট বাজিয়ে আমাকে তার দুটো টিউন শোনাল :—

(১)

দিদির টান দিদির টান!
পিসীর টান, মাসীর টান!
পিসী মাসী, পিসী মাসী,
তালুই থালুই, তালুই থালুই,
বেহাই বেহান, বেহাই বেহান,
দিদির টান! দিদির টান!
ভাতের টান! মাছের টান!
ঘিয়ের টান! দুধের টান!
টানাটানি, টানাটানি!
শাড়ির টান! ধুতির টান!

বিজয়া দশমীতে মিলিয়ে দেখবেন।

(২)

ধড় মুড় যায় গঙ্গা জলে
হাড়গোড় যায় গঙ্গাজলে
সব বুড়ো যায় গঙ্গাজলে!

বিবেকানন্দ রোডে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত এই তাল শুনি যখন লরীর পর লরী ছোটে। হেমা! তুই আমাকে আসল দুর্গাভক্তি শিখিয়েছিলি, তোর সুরে আজও আমি মহামায়াকে পাই। দুর্গাই তোকে পাগল

করেছিল। যদি ঢাকে কাটি দেওয়াটাও শেখাতিস, তাহলে অন্নপূর্ণাকে আমার শুনো পেটটা বাজিয়ে আজ দেখিয়ে দিতাম।

বিজয়া দশমীর পর তিন দিন বাইনাচের ধুম। শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট থেকে লোক ভেঙে পড়েছে লখনউয়ের মতিজানের নাচ দেখবে বলে। আসরে বৈদান্তিক পিতৃদেব চন্দ্রশেখর সভাপতি। নাচগান জমছে না, কেবল "লচক্‌নেওয়ালী কোমর" নিয়ে নর্তকী অঙ্গভঙ্গী করছে আর বিকট চীৎকার করছে "তেরি মেরি সৈঁইয়া" বলে।

এমন সময় পশ্চিমের বিখ্যাত "ল-ইয়ার" অতি সুপুরুষ দীর্ঘকায় কেদারবাবু সভায় এলেন। সব আঙুলেই হীরের আংটি, সাজগোজ অতি জাঁকাল। "কেমন গান হচ্ছে?" চন্দ্রশেখর বললেন, "ভাল নয়।"

কেদারবাবু ধমক দিয়ে বললেন "চন্দ্রবাবু, এ আপনার দোষ! বাহবা দিয়েছেন?" বৈদান্তিক লজ্জায় পড়ে বললেন, "না!"

সংযমী বৈদান্তিক কি কখনো বাইজীর বহ্বাড়ম্বর বা নাচের আসরের বিশৃঙ্খলা সংযত করতে সক্ষম?

কেদারবাবু বললের, "এনকোর না দিলে অ্যাকট্রেস অ্যাক্ট করে না, বাহবা না পেলে কবির মুখে কাব্যি ফলে না। উঠে যান আপনি, আসন ছেড়ে দিন, বেদান্ত উপনিষদে বেরিয়ে গিয়ে অনর্গল বক্তৃতা দিন। নদীয়ায় পণ্ডিত শ্রোতার অভাব নেই। বাইনাচের সমান ভীড় দেখবেন।"

কেদারবাবু গর্জন করলেন, "ওআঃ খুব! খেয়া খুব!" তন্বী মতিজান নূতন সুরে নূতন পা ফেলে গাইল নূতন চাহনি বাণ হেনে :—

সুরতিয়া দেখায়ে যাও রে

ছায়েল সৈঁইয়া

কেদারবাবু বললেন, "ডাকের সুন্দরী তুই মতিজান! লখনউয়ের নাম ডোবাস নি দিদিমণি আমার! তোমার অলৌকিক কণ্ঠ-কল্লোলস্রোতে ভেসে গিয়ে নওয়াব অব রামপুর তোমাকে মাসিক সাত হাজার মুদ্রা দক্ষিণায় তাঁর স্টেট সংসৃট্রেস পদে বরণ করেছিলেন!"

কেদারবাবুর সাহস পেয়ে আট সহস্র শ্রোতা নিনাদ করল, "কেয়াবাত হ্যায়!" সেই তালে স্পন্দন রেখে, বাড়িয়ে-দেওয়া দুই করপল্লব দেখিয়ে, কোকিলকণ্ঠী মতিজান গাইল :—

"যৌবন বীতা যায়!"

কেদারবাবুর অনুরোধে মতিজান কৃষ্ণপ্রেম গাইল; বেলোয়ারী ঝাড়ের আলোকে রত্নাভরণ দেহ-আলোড়নে ঝলকিত হ'ল :—

"শ্যাম টিট নাহি মানে!"

শ্রোতাদের মন প্রাণ নিল হরে,—"ঝরঝর জল নয়নে ঝরে!" সংগীত তরঙ্গে সভা কম্পিত, যেন কাননের বুভুক্ষু বুলবুল শ্যাম-সন্ধানে আকাশে ছুটেছে, যেন মুরারি-মুরলীতান-লহরী ও বুলবুল-রাগিণী মিলে তর তর বয়ে যাচ্ছে!

ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক, না নিত্যানন্দ মজলিসী সুপুরুষ পূজা-প্রাঙ্গণে পতিতা নারীকে পূত করলেন? কোন্ সাহসী পুরুষ

"ঘুচাল তাহার মনের আঁধার
করিলা চেতনা দান,
সঁপি দিলা তার মধুর কণ্ঠে
হরিনাম-গুণগান?"